ডুমুরিয়ার কৃষক আন্দোলন ও বিষ্ণু চ্যাটার্জী

মীর আমীর আলী

ডুমুরিয়ার কৃষক আন্দোলন
ও
বিষ্ণু চ্যাটার্জী

—মীর আমীর আলী

DUMURIAR KRISHAK ANDOLAN O' BISHNU CHATTERJEE : Chronological study on peasant movement of Dumuria, Khulna, Bangladesh.
First Print : January 25, 1986.

(সর্বসত্ত্ব লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত)

প্রথম প্রকাশঃ ১১ই মাঘ ১৩৯২; ২৫শে জানুয়ারী ১৯৮৬
মূদ্রণেঃ উত্তরণ প্রেস স্যার ইকবাল রোড, খুলনা
প্রচ্ছদঃ আজমল হোসেন। ৮, শান্তিধাম, খুলনা
ব্লক ঃ ঢাকা ব্লক আর্ট, খুলনা

মূল্যঃ বোর্ড বাঁধাই—২৪'০০ টাকা
সুলভ—১৮'০০ টাকা

লেখকের নিবেদন

১৯৮৩ সালে লেখাটি যখন স্থানীয় একটি দৈনিকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় তার পর পরই স্থানীয় কয়েকটি নাট্যগোষ্ঠী এমন কি খুলনা বেতারও "শোভনার বাঁধ" শীর্ষক নাটক পূনঃ পূনঃ মঞ্চস্থ হয়। কোন বিশিষ্ট চলচ্চিত্রকারও নাকি ইতিমধ্যেই ইহার চিত্ররূপ দেবার চিন্তা-ভাবনা করেছেন। এ সব দৃষ্টে এ দুর্মূল্যের বাজারেও গ্রন্থটি প্রকাশের দারুণ সাধ জাগে। কিন্তু সাধের সাথে সামর্থের অভাবে মুদ্রণের দিন যতই পিছিয়ে যেতে থাকে ততই আত্মদগ্ধ হতে থাকি। ইত্যবসরে পরম শ্রদ্ধাষ্পদ-হিতাকাক্সক্ষী মিঃ মাইকেল সুশীল অধিকারী ও বাংলাদেশ ব্যাংকের মিঃ নাফিউদ্দিন আহমেদ সাহেবের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইনডাষ্ট্রিজ করপোরেশন সাতিশয় অনুগ্রহ করে দশ রীম 'লেখক' কাগজ দিলে কাগজ সমস্যার সমাধান হয়। কিন্তু সদাশয় সচিবের স্মারক পত্র নিয়ে যখন নিউজ প্রিন্টে যাই তখন মিলে ২৩" × ৩৬" কাগজ ছিলনা। তাই আমাকে নিতে হয়েছে ২০" × ৩০" কাগজ। কিন্তু ঐ কাগজে সঠিক সাইজের পুস্তক মুদ্রণে অসুবিধা দেখা দেয়। তখন খুলনা শিক্ষক ফেডারেশনের সভাপতি—অপর সুহৃদ—কাজী ফারুক আহমেদ সাহেব গ্রন্থটিকে বর্তমান সাইজে করে অর্ধেক নিউজ-প্রিন্ট আর অর্ধেক লেখক কাগজে করার উপদেশ দিয়েই ক্ষান্ত হননি, লেখক কাগজের অপ্রয়োজনীয় অবশিষ্টাংশের পরিবর্তে পরিমিত নিউজ প্রিন্ট সরবরাহের ব্যবস্থাও করে দিয়েছেন। তাকে কি বলে যে কৃতজ্ঞতা জানাবো জানিনে। এ ফারুক সাহেবই প্রায় সম্পূর্ণ টাকা বাকী রেখেই

(আবার যে টাকা দেয়া হয়েছে, তাও দিয়েছেন গ্রন্থ বিজ্ঞানী—অনুজ প্রতিম—জনাব শেখ আইউব আলী) গ্রন্থটি মুদ্রিতও করিয়ে দিয়েছেন।

উল্লেখ্য, "খুলনা শহরের ইতিকথা" গ্রন্থখানি প্রকাশের পর দেশের প্রায় প্রতিটি জাতীয় দৈনিক এবং সাপ্তাহিক—রোববার, বিচিত্রা, সচিত্র সন্ধানী প্রভৃতিতে ফটোসহ, এমন কি জাতীয় টেলিভিশন ও খুলনা বেতারে এত অধিক আলোচনা ও পর্যালোচনা হয়েছে—যা আমার ন্যায় হেলা-ফেলা অপর কোন লেখকের ভাগ্যে জোটেছে বলে আমার জানা নেই। উপরন্তু বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক-গবেষক গুরুগণ চিঠি দিয়ে, এমন কি ডঃ মোকশেদুল হক চৌধুরীর মত পণ্ডিত ব্যক্তিও সাতিশয় অনুগ্রহ করে অধমের পর্ণ কুঠিরে এসে গ্রন্থটি সংগ্রহ করে আমায় শুধু কৃতার্থই করেননি—বর্তমান গ্রন্থটি লিখতেও দারুণ ভাবে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

আমার বাঁচার সংগ্রাম, চাকুরী রক্ষার সংগ্রাম 'আর দৈনন্দিন পারিবারিক হা হুতাশ মোকাবেলার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কোন সৃষ্টি-ধর্মী সাহিত্য চর্চা শুধু দুসাধ্যই নয়' অসম্ভবও বটে। তবে পাণ্ডুলিপি যখন লিখি তখন সপ্তাহে দু'দিন ছুটি পেতাম। আর পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করতে সপ্তাহে পর পর ঐ দু'দিন ছুটির সদব্যবহার করেছি। অভাগা দেশে আমার সে সুযোগটিও আজ তিরোহিত হয়েছে—যদিও পাশ্চাত্য দেশগুলিতে ঐ সুযোগটি বহু পূর্ব থেকেই বলবত আছে। বস্তুতঃ লেখা সম্পর্কে প্রখ্যাত লেখক সমার সেট মমের বক্তব্য: Writing is a whole time job. To write must be the main object of author's life, that is to say he must be a professional writer.

গ্রন্থের তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে দেখি যে শহুরে তাত্বিক এমন কি বিষ্ণুদার এক কালীন শহুরে সহচরগণও আন্দোলনের কোন ধারাবাহিক ঘটনাই জানেন না। সব চেয়ে বিস্ময়ের বিষয় যে বিষ্ণুদার সব চেয়ে ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব বিষ্ণুদার একটি ফটো বা এমন কি সুদূর কোলকাতা থেকে প্রকাশিত "অমর কৃষক নেতা বিষ্ণু চ্যাটার্জী" শীর্ষক সংকলনটিও

দিতে পারেন নি। গ্রন্থটির জন্য আমি সম্ভাব্য সকলের দ্বারে দ্বারে পুনঃ পুনঃ ধর্ণা দিয়ে ব্যর্থ হয়েই ফিরে এসেছি। এদিকে ঐ সময় ঐ অঞ্চলে যারা সক্রিয় ছিলেন তাদের প্রায় সকলে ইতিমধ্যেই হয় ইহ-লোক ত্যাগ নয়তো দেশ ত্যাগ করেছেন। আর যারা আছেন তারা আত্মপ্রসাদ পূর্ণ যে তথ্য পরিবেশন করেছেন তার থেকে সত্য—মিথ্যা বাছাই করা এক বা সাত সমুদ্রই নয়, মহা সমুদ্র মন্থনও বটে। তাদের মধ্যে ব্যতিক্রম ভদ্রদিয়া নিবাসী নগেন সরকার মহাশয়, আর সর্বজনমান্য এডভোকেট জনাব দেলদার আহমেদ। ঐ আন্দোলনে একদিকে তথ্য পরিবেশনের বিশ্বাসযোগ্য লোকের অভাব, আবার যাওয়া মেলে তাদের পরিবেশিত তথ্যের সঠিকতা যাচাইয়ের জন্য ট্যাকের পয়সা খুইয়ে পুনঃ পুনঃ ঐ অঞ্চল উল্‌কার ন্যায় ঘুরে বেড়িয়েছি। পাঠকই জানেন এতে কতটা সফল হতে পেরেছি। শ্রদ্ধেয় তদানীন্তন কর্মী রামলাল বিশ্বাস (দাদু) ঐ সময় বৈঠাঘাটার অচিন্ত্য বিশ্বাস মহাশয়ের কাছ থেকে পূর্বোক্ত গ্রন্থটি এনে দিয়েছেন। তার জানা বহু তথ্যও দিয়েছেন এবং আমাকে নিয়ে ডুমুরিয়া, ধানবুনিয়া, বৈটাঘাটা প্রভৃতি অঞ্চলে পূনঃ পূনঃ চষে বেড়িয়েছেন। সত্যকথা বলতে কি, ঐ দাদুর ঐ সাহচর্য ও সহযোগিতা না পেলে এ দুরূহ কাজ আমা দ্বারা সম্ভব হতো কিনা দারুণ সন্দেহ আছে।

ডুমুরিয়ার চিত্তরঞ্জন গোলদার, 'অধীর কুমার মণ্ডল, স্বপন কুমার রায় প্রমুখ নওজোয়ান দারুণ তারুণ্য নিয়ে বার বার সাক্ষাৎ করে আমায় যে উৎসাহিত করেছেন তা উল্লেখ না করলে তাদের প্রতি দারুণ অবিচার করা হবে।

বস্তুতঃ গ্রন্থটি লিপিবদ্ধ করতে সক্রিয় সহায়তা করেছেন সহ-অধ্যক্ষ বেগম মাজেদা আলী ও অধ্যাপক শেখ আব্দুল কাফি। আর লেখাটির ভাষাগত, ভাবগত এমন কি শব্দগত পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজন করে বর্তমান পর্যায়ে এনে দিয়েছেন শ্রদ্ধেয় জনাব মিজানুর রহিম—মিজান ভাই। গ্রন্থটির নামকরণও তিনিই করে দিয়েছেন। অতএব

ন্যায়তই স্বীকার করতে হয় যে, এ লেখায় আদতে আমার কোন কৃতিত্বই নেই। এটি পড়ে পাঠক যদি সামান্যতমও উপকৃত হন, তবে তার সমুদয় কৃতিত্বই বর্তাবে উপরোক্ত সুধীবৃন্দের' পরে। আর সমুদয় ত্রুটি-বিচ্যুতির দায়-দায়ীত্ব একমাত্র এ অধমের।

কাগজের অপচয় ঘুচিয়ে স্বল্প পরিসরে অধিকতর লেখা সন্নিবেশ করে, সুলভ কাগজে দুর্লভ আলোক চিত্র ও তথ্য বহুল ঘটনার সমাবেশ ঘটিয়ে, জুস সেলাই ও জু'সই বাঁধাই দিয়ে গ্রন্থের মূল্য সবার নাগালের মধ্যে রাখার যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে, সুধি পাঠক হৃদয় দিয়ে তা অনুধাবন করবেন—এ মিনতি রেখেই সমাপ্তি টানছি।

—মীর আমীর আলী

তাং ২৫/১/৮৬ ইং
"স্বাগতম কুঞ্জ"
১৫, দোলখোলা রোড,
খুলনা।

ভূমিকা

বৃটিশ আমল থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে অনেক কৃষক আন্দোলন হয়েছে। এই সব আন্দোলন সারা বাংলাদেশের প্রত্যেকটি অঞ্চলে একই ভাবে হয়নি। সেটা হওয়ার কথাও নয়। কাজেই কোন কোন অঞ্চলে আন্দোলন অনেক ব্যাপক ও তীব্র হয়েছে। আবার কোন কোন অঞ্চলে তার ব্যাপকতা ও তীব্রতা অনেক কম থেকেছে। যে অঞ্চলগুলিতে বৃটিশ ও পাকিস্তান আমলে কৃষক আন্দোলন যথেষ্ট শক্তিশালী ভাবে সংগঠিত হয়েছিলো সেগুলির মধ্যে খুলনা জেলার ডুমুরিয়া নিঃসন্দেহে অন্যতম।

প্রকৃতপক্ষে তিরিশের দশক থেকেই কৃষক আন্দোলন বাংলাদেশে ভালভাবে দানা বাঁধতে শুরু করে এবং সেই পর্যায় থেকেই ডুমুরিয়াতে সূত্রপাত হয় সংগঠিত কৃষক আন্দোলনের। ১৯৩৬ সালে সারা ভারত কৃষক সভার প্রতিষ্ঠা এবং খুলনা জেলায় এই সংগঠনের প্রাথমিক সাংগঠনিক কাজের মাধ্যমে কৃষক আন্দোলন ধীরে ধীরে পরিগ্রহ করে সুষ্ঠু সাংগঠনিক চরিত্র।

ডুমুরিয়া অঞ্চলে এইভাবে যে কৃষক আন্দোলন শুরু হয় তা এক দিকে যেমন কতগুলি জীবন্ত স্থানীয় সমস্যাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে তেমনি তা স্থানীয় গণ্ডী অতিক্রম করে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথেও যুক্ত হয়।

ডুমুরিয়ার ঐ দীর্ঘ কালব্যাপী চলমান আন্দোলনের অগ্রণী কর্মী ও নেতা হিসেবে বিষ্ণু চ্যাটার্জী নিরলসভাবে সক্রিয় থাকেন এবং কৃষক জনগণের মধ্যে এমন এক ধরণের জনপ্রিয়তা অর্জন করেন যা পরবর্তী পর্যায়ে অন্য কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি।

বিষ্ণু চ্যাটার্জী শুধু যে একজন কৃষক নেতা ছিলেন তাই নয়, কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য ও নেতা হিসেবেও তিনি সাংগঠনিক ভাবে সক্রিয় ছিলেন।

মীর আমীর আলী সাহেব তাঁর 'ডুমুরিয়ার কৃষক আন্দোলন ও বিষ্ণু চ্যাটার্জী' নামক এই গ্রন্থে ডুমুরিয়ার কৃষক আন্দোলনের যে ইতিহাস বিধৃত করেছেন তাতে তিনি শুধুমাত্র বিষ্ণু চ্যাটার্জীর ব্যক্তিগত কৃতিত্বের কাহিনী লিপিবদ্ধ না করে মূলতঃ ঐ অঞ্চলের কৃষকদের

সংগঠিত সংগ্রামের ইতিকথাই লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন। একাজ করতে গিয়ে বিষ্ণু চ্যাটার্জীর ভূমিকাকে তিনি সামনে নিয়ে এসেছেন। এটাই স্বাভাবিক। কারণ ডুমুরিয়ার কৃষক আন্দোলনের ইতিহাসের মধ্যে বিষ্ণু চ্যাটার্জীর রাজনীতি ও সাংগঠনিক কাজ ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত।

এই ধরণের একটি গ্রন্থ রচনা কোন সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। যাঁরা আমাদের দেশের গবেষণা কাজের সংগে সামান্য পরিচিত তাঁরাই জানেন যে, এ কাজ করতে গিয়ে কোন মাল মসলা ও তথ্য পাওয়া এক দুরূহ ব্যাপার। আমাদের দেশে এই ধরণের তথ্য সংগ্রহ বা রক্ষণের কোন ব্যাবস্থা নেই। পুলিশী আক্রমনের ফলে অনেক তথ্য নানাভাবে বিনষ্ট হয়েছে। অনেকে ভয় ভীতির ফলে নিজেরাই ঐ ধরণের তথ্যমূলক কাগজ-পত্র বিনষ্ট করেছেন। এই পরিস্থিতিতে কোন কিছু লেখা সত্যিই এক কঠিন কাজ।

এই অসুবিধা কিছুটা দুরকরা যেতে পারে আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যাক্তিদের সাথে সাক্ষ্যাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে। কিন্তু এই দীর্ঘকাল যাঁরা নানা পর্যায়ে ডুমুরিয়ার কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁদের অধিকাংশই আজ মৃত এবং অনেকে ভারতে।

এত সব অসুবিধা সত্ত্বেও যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করে মীর আমীর আলী সাহেব ডুমুরিয়া অঞ্চলের কৃষক আন্দোলনের একটি তথ্যপূর্ণ ইতিহাস রচনা করতে সমর্থ হয়েছেন। এর জন্য তাঁর প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

গ্রন্থটিতে তিনি কিছু বিষয়ে যেসব ব্যক্তিগত মতামত ব্যক্ত করেছেন তার সাথে সকলে একমত না হতে পারেন। কিন্তু তার জন্য গ্রন্থটির মূল্য কম হওয়ার কথা নয়, এটি একদিকে যেমন বাংলাদেশের কৃষক আন্দোলনের সর্বাত্মক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে তেমনি সহায়ক হবে তাঁদের ক্ষেত্রে যারা খুলনা জেলায় বা সারা বাংলাদেশে নোতুন করে কৃষক আন্দোলন সংগঠিত করতে সক্রিয়ভাবে নিযুক্ত।

এই দ্বিবিধ কারণে আমি মনে করি এই গ্রন্থের বহুল প্রচার হওয়া প্রয়োজন। আশা করি এ দিক দিয়েও গ্রন্থটি সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হবে।

বদরুদ্দীন উমর

১৪/১/১৯৮৬

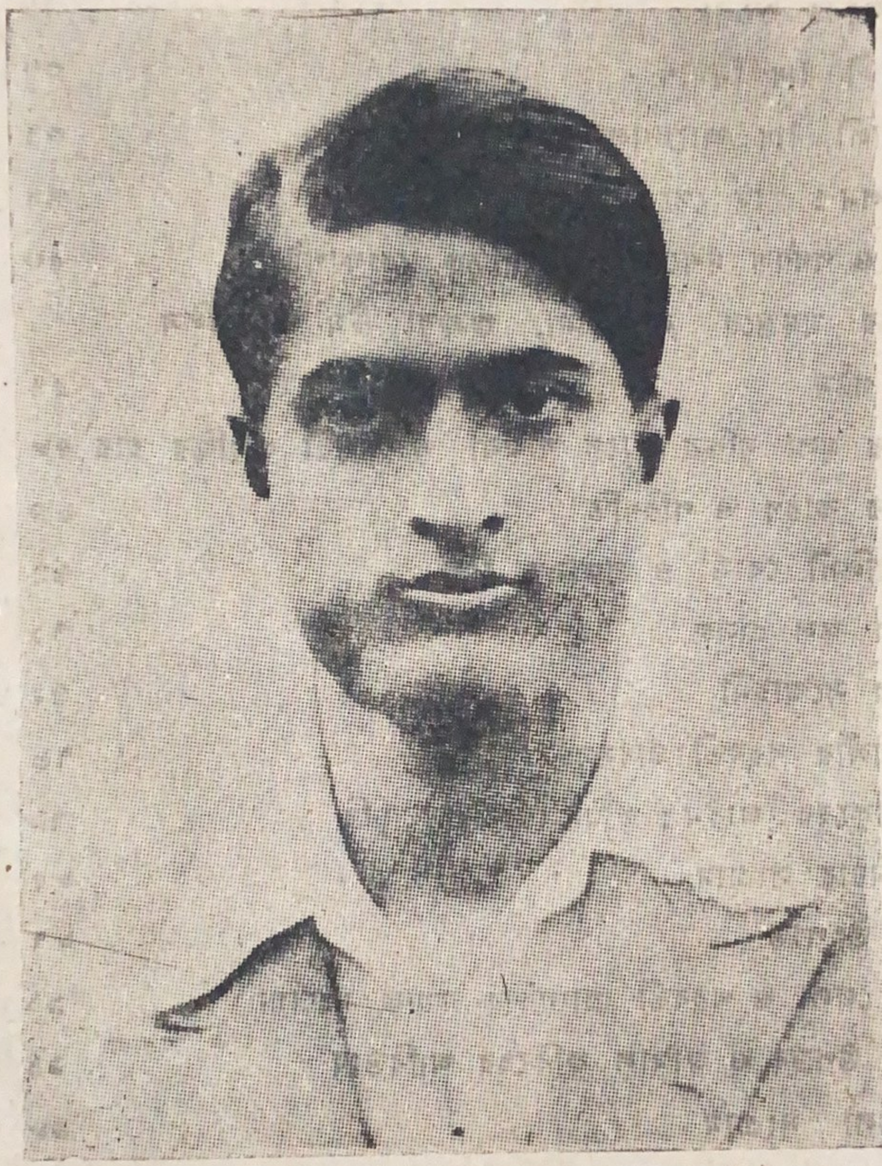

বিষ্ণু চ্যাটার্জী

সূচীপত্র

পটভূমি	৯
ভূমি ব্যবস্থা ও খাজনা আদায়ের পূর্বাপর প্রণালী	১৮
আন্দোলনের সূচনা	২০
শাখাবাকী বাঁধ নির্মাণ	৩০
জেলেখালী বাঁধ আন্দোলন	৩৭
আন্দোলন : গ্রাম থেকে শহরে	৪৭
চল্লিশ ও পঞ্চাশ দশকের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট	৫০
পঞ্চাশের মন্বন্তরে লঙ্গরখানা, শুশ্রূষা টিম ও শালিস কমিটি গঠন	৫৭
চাউলের মূল্য বৃদ্ধির সাথে খাজনা ও মজুরী প্রবৃদ্ধির হার	৫৮
দুর্ভিক্ষের কারণ ও পরিণতি	৬৩
ঋণ শালিসী বোর্ড ও প্রজাসত্ব বিল	৬৭
শোভনা স্কুল প্রসঙ্গ	৭১
বিষ্ণুদার সম্মোহনী	৭২
জেলেখালীর পরবর্তী বাঁধসমূহ	৭৬
বিষ্ণু ঠাকুরের আইন : জমিদারের ধান চুরি	৭৯
ধানিবুনিয়ার সংগ্রাম	৮৫
পুলিশী উৎপাত	৮৭
তৃতীয় জেলা ও পরবর্তী প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলন	৯১
পুলিশী উপদ্রব ও জামাল ফকিরের আবির্ভাব	৯৪
জীয়লতলা সংগ্রাম	৯৮
জামাল ফকির হত্যা	১০৬
মীর জাফরের মীর জাফরী : বিষ্ণুদা' বন্দী	১১৩
ষাট ও সত্তর দশকের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট	১১৯
পরিশিষ্ট	১৩৯

ডুমুরিয়ার কৃষক আন্দোলন ও বিষ্ণু চ্যাটার্জী

—মীর আমীর আলী

"কোন সে যাদুই চেরাগ, যার পরশে দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত অঞ্চলটি উদ্বৃত্ত অঞ্চলে রূপান্তরিত হলো"—তা জানার বাসনা কার না জাগে ?

খুলনা জেলার ডুমুরিয়া অঞ্চলের তরি-তরকারী ও শাক-সবজী শুধু বিখ্যাতই নয়, এত প্রাচুর্যও যে পার্শ্ববর্তী দু'দু'টি জেলা শহর—খুলনা ও যশোরের বাজারে না উঠলে তার বাজারই জমজমাট হয় না।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, থুকরা, খরনিয়া, চুকনগর প্রভৃতি অঞ্চলের পণ্য কেশবপুর হয়ে যশোর, আর অবশিষ্টাংশ যেমন—শোভনা, জিয়লতলা ইত্যাদির পণ্য কৈয়া হয়ে খুলনা বাজারজাত হয়। পূর্বোক্ত খুলনা ও যশোর ছাড়াও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পণ্য বরিশাল এমন কি ঢাকাও রপ্তানী হয়ে থাকে।

উপরোক্ত ডুমুরিয়া থানারই একটি ইউনিয়নের নাম শোভনা। আহ : কি মরমিয়া নাম ! সে শোভনার ওল, কপি, বেগুন, ডাটা প্রভৃতি স্বাধেই শুধু বিখ্যাত নয়, প্রাচুর্যেও বিখ্যাত। তার কুল ও কাগজীলেবু সুদূর ঢাকায়ও রপ্তানী হয়ে থাকে। ধান ও রবিশস্য ছাড়াও সেখানে উৎকৃষ্ট মানের পাটও জন্মে থাকে। ঐ শোভনা বা বৃহত্তর অর্থের তার থানা বা হালের উপজেলা ডুমুরিয়াকে নিয়েই এ লেখা।

উক্ত শোভনা অঞ্চল আজ সুজলা সুফলা হলেও হাল শতাব্দীর চল্লিশ দশকের বছরগুলিতে ধান তো ধান, এমনকি তার চিটেও ফলতো না। বাঁধ-বন্দির অভাবে সমুদ্রের লোনা জল হুড় হুড় করে মাঠে

ঢুকে শস্যহানী ঘটাতো। আর তারই পরিণতিতে বছরের পর বছর লেগে থাকতো অভাব, অনটন আর দুর্ভিক্ষ।

পূর্বে অবশ্য ঐ অঞ্চলে বাঁধ-বন্দি ছিল। হাল শতাব্দীর চল্লিশ দশকে ঐ বাঁধ ভেংগে একাকার হয়ে লোনা জলে থৈ থৈ করতে থাকে। অসহায় কৃষকগণ তাকে ভগবানের অভিসম্পাত বলে মণে করতো। আর তাই মুসলমানগণ আল্লার অনুগ্রহের আশায় মল-মলিয়া মসজিদে মানতো মানত, বিভিন্ন মাজার ও দরগায় দিতো শিন্নি। পক্ষান্তরে হিন্দুগণ ভগবানের কৃপা পাবার আশায় দিতো বিভিন্ন মাংগলিক পূজা। তারা বালইঝাকি আবাদ আর জয়খালিতে দিতো কালী-পূজা। পূর্বপাড়া আর মালোপাড়ার হরিতলা আর কলাবনিয়ায় দিতো হরি-পূজা, দুধভাতুয়া বিলে দিতো মহাদেবের ভোগ (বলাই বাহুল্য যে, তৎ-পূর্বে কোন বৃহৎ বাঁধ বাঁধতে বা দুর্ভিক্ষ ঠেকাতে এ বাংলার বুকে মানুষকে মানুষ বলি দিতো ঘটা করে)। তবে যত ঘটা করেই সে ভোগ বা পূজা দেয়া হোক না কেন প্রতি বছরান্তেই দেখা দিতো অধিকতর ফসলহানী আর দারিদ্র। আর তাই তারাও প্রতি বছরান্তেই অধিকতর ঘটা করে কালী ও হরিপূজা দিয়ে এবং মহাদেবকে ভোগ দিয়ে হৃদয় নিংড়ানো আকুতি জানাতো। কিন্তু হায়! পরের বছরের দারিদ্র রূপ নিতো আরও প্রকটতর রূপে। এভাবে অধিকতর ভোগ দেয়া আর অধিকতর ফসলহানীর আবর্তে পড়ে এক সময় তারা সে ভোগ দেয়ার সামর্থও হারিয়ে ফেলে। নিজেদের সন্তানরাই যেখানে এক নাগাড়ে দু'চার দিন থাকতো অভুক্ত, সেখানে দেবতাদের ভোগ দেয়ার সামর্থই বা আসবে কোত্থেকে?

উপরোক্ত অসহনীয় দারিদ্রের মুখে আসে একের প্রতি অপরের অবিশ্বাস, সহানুভূতিহীনতা আর অশ্রদ্ধা। প্রত্যেককে যখন নিজ নিজ আহারের চিন্তায় আত্মস্বার্থকেন্দ্রীক হয়ে ওঠে, তখন তাদের ঐক্যবদ্ধ ভাবে সামগ্রিক সমস্যা সমাধানেরও অবকাশ থাকে না। তাই তখন

যে যার নিজেকে নিয়েই ছিল ব্যস্ত (আলোচ্য সময় এক হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যেও ছিল আভ্যন্তরীন চরম সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব। এক পরিবারের লোক অপর পরিবারের জল পর্যন্ত খেতো না—বিবাহাদিতে যোগদানেরতো প্রশ্নই ওঠে না)।

ঐ ঘোর দুর্দিনে জমিদারগণ কৃষককুলের ক্লেশ লাঘব করাতো দুরের কথা, তারা বরং পরস্পরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে মজা দেখতেন। তখনকার বছরের পর বছরের ঐ ফসল হানীর মোকাবেলা করতে পারতো এক সরকার—যেমন, শের শাহের আমলে সরকার বাঁধ-বন্দি দিয়ে, রাস্তা-ঘাট করে সেচের ব্যবস্থা করেছিলেন। আর পারতেন জমিদার। কিন্তু তৎকালীন বেনে ইংরেজ সরকার এদেশে এসেছিলোতো ব্যবসা করে লুট করতে; কৃষকদের মঙ্গলার্থে নয়। আর ঐ শোষক জমিদারগণ কৃষকদেরই শ্রম-লুণ্ঠিত সম্পদ দিয়ে মহা আরাম আর আয়েসে থাকতেন শহরে। তাদের একজন থাকতেন খুলনা সার্কিট হাউজ ময়দানের দক্ষিণদিকের লাল দালানে, আর অপর জন থাকতেন কবরখানা (সিমেট্রি) রোডের পূর্বদিকের প্রাসাদোপম অট্টালিকায়। বলা তো যায় না যে ঐ অশিক্ষিত অসভ্য, আদব-কায়দাহীন ভূখা-নাংগা কৃষককুল কখন তাদের অপমান, এমনকি তাদের উপর চড়াও হয়ে বসবে! তাই তারা ঐ ভূখা নাংগাদের ধরা-ছোঁয়া থেকে নিশ্চিত দূরে থাকতেন। তাদের নায়েব-গোমস্তারা বিভিন্ন কাচারী যেমন—পূর্বপাড়ার গাবতলা ঘাট, জিয়লতলা আর আবাদের বলাবুনিয়া থেকে কৃষকদের অত্যাচার, উৎপীড়ন আর নিপীড়ন করে খাজনা আদায় করতেন; স্থানভেদে কৃষকদের উৎখাত করে জমিটা জমিদারের খাস দখলে নিয়ে নিতেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, ঐ সময় ঐ অঞ্চলের কৃষকগণ অভাবের তাড়নায় দশ-বার বছর যাবৎ খাজনা দিতে পারেনি। কূট জমিদারগণ তখন সরকারকে শুনান দিতো যে, ঐ অঞ্চলের কৃষকগণ রাষ্ট্রদ্রোহী হয়ে খাজনা দিচ্ছে না। বেকুব সরকার কারণ না

খুঁজেই তাদের শুনানীতে বিশ্বাস করে বসতো, আর চালাতো কৃষকদের উপর নির্যাতন।

এদিকে জমিদারগণ জমি খাস দখলে নেবার প্রথম পর্যায়ে কৃষকদের বিরুদ্ধে মামলা-মোকর্দ্দমা করতেন। ঐ সময় পেনাল কোডের সবক'টি ধারা দিয়ে কৃষকদেরকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলতেন। জমির স্বত্ব নিয়ে, ধান কাটা নিয়ে, জমির আল নিয়ে, গরু-ছাগল নিয়ে, চুরি, রাহাজানি, মারামারি, ঘর জ্বালানি—এমনকি মেয়েছেলে নিয়েও সত্য-মিথ্যা মামলা জুড়ে দিতেন—যার একমাত্র উদ্দেশ্য, জমি থেকে উৎখাত করে তাদের জমি খাস করে নেয়া। ঐ পর্যায়ে একদল কৃষক হাজত খাটতো এবং উকিল মোক্তার লাগিয়ে বেরিয়ে আসতো। পর মুহূর্তেই আর একদল হাজত বা জেলে যেতো। এভাবে কৃষকদের বেশ জব্দ করা গেলেও ঐ প্রক্রিয়ায় জমি খাস করতে সময় লাগতো প্রচুর। তদুপরি সে মামলা মোকর্দমায় জমিদারেরও বেশ একটা খরচ হতো। ফেরেববাজ আইনজ্ঞরা নির্যাতনমূলক আইনের ফন্দি-ফিকির বাতলে প্রচুর পারিতোষিক আদায় করতেন।

পরবর্তীতে জমিদারগণ দেখলেন যে, জমি খাস করার জন্য ঐ মামলা-মোকর্দ্দমার ঝকমারী পোহাবারই কোন প্রয়োজন নেই। তারা তাদের পোষ্য বরকন্দাজ দিয়ে কখনও ঘরের চালের কোণা কেটে, কখনও বা সমুদয় ঘর পুড়িয়ে, আবার কখনও বা ভাড়াটে লেঠেলদের লাঠির আঘাতে কৃষকদের উৎখাত করতেন। ঐ অসহায় অবস্থায় প্রাণের ভয়ে অনেকে আগে-ভাগেই ঘর-বাড়ী ছেড়ে চলে যেতো।

জমিদারের সে অত্যাচারের মুখে প্রজাদের প্রতিরোধ করার, বা এমনকি ক্ষীণ প্রতিবাদের ক্ষমতাও ছিল না। তারা অসহায় ভাবে জমিদারকে বাপ-মা, ভাগ্যবিধাতা বলে সম্বোধন করতো—যদিও অন্তরে অন্তরে তাদের প্রতি ছিল চরম অশ্রদ্ধা ও অভক্তি। জনশ্রুতি যে, হঠাৎ গজান এক কুলের কুলীন ভট্টাচার্যীরা খাজনা ও দাদনের সুদ

আদায়ের জন্য কৃষক সাধারণের উপর এমন শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালাতেন যা কোন সভ্য সমাজে অকল্পনীয়। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, সে সময় সে অঞ্চলের সাত গ্রামের মাতব্বর ছিলেন ধলু সরদার; লোকে বলতো বড় মিয়া! প্রতিটি সামাজিক কর্মকাণ্ডে তিনি ছিলেন অপরিহার্য। সমাজের কাজে ডাক পড়লেই ধলু সরদার সাদা তহবন আর ঢোলা সাদা পীরহানটি গায়ে দিয়ে একখানা বাঁশের লাঠি নিয়ে আস্তে আস্তে চলতেন। সাদা দাড়ি ও দীর্ঘ দেহ দেখে অনেক দূর থেকেই বুঝা যেতো যে ধলু সরদার আসছেন। সে লোকটিকে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সবাই শ্রদ্ধা ও সম্মান করতো। তার বয়স হয়েছিল ৮০/৮৫ বৎসর।

ঐ সময় জমিদারের হুকুম এলো, ধলু সরদারকে কাচারীতে হাজির করতে হবে। খাজনা দিতে সে না পারে না দিক, জমি ইস্তফা দিয়ে যাক।

ধলু সরদার কিন্তু এ যাবৎ সবার আগে খাজনা পরিশোধ করে আসছিলেন। কিন্তু গত ৪/৫ বছর ধরে জমিতে একটি দানাও ফলেনি। নিজেই যেখানে খেতে পারেন না, সেখানে খাজনা দেবেন কোত্থেকে? তখন সমস্ত বিল ছিল লোনা জলে টৈ-টম্বুর।

জমিদারের ঐ হুকুম তামিল করার জন্য ২/৩ জন বরকন্দাজ লাঠি সোটা নিয়ে আসে ধলু সরদারের দাওয়ায়। সে সময় বৃদ্ধ ও রুগ্ন পিতার জন্য বালি পাক করছিলো ধলুর কন্যা আমেনা। সে ছিল মাতৃহারা। বরকন্দাজদের দেখে আমেনা চিৎকার দিয়ে কেঁদে ওঠে—"তোমরা আমাগে আব্বারে নিয়ো না, আমাগে কিছুই নাই; খাজনা দেবো কন্‌তে।"

বরকন্দাজরা তখন আমেনাকে একটা কুৎসিত গলা দিয়ে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে ধলুকে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যায়। ঐ অসুস্থ

শরীরে তার তখন চলার ক্ষমতাও ছিল না। ★

জমিদারের কাচারীতে ধলু সরদারের উপর চললো অমানুষিক অত্যাচার। প্রথমতঃ তার প্রতি হুকুম হলো, ঠায় দাড়ায়ে থাকার। কিন্তু তার তখন দাঁড়াবার ক্ষমতা ছিলনা। অসুস্থ শরীরে অতটা পথ হেঁটে এসে দাঁড়াবার চেষ্টা করেও পড়ে যাচ্ছিলেন। তাঁকে পুনঃ পুনঃ দাঁড় করার পর পড়ে যাওয়ায় তার প্রতি হুকুম হলো-ঠায় বসে থাকার। সে সময় ধলু সরদারের অনতি দুরে দাড়িয়ে শাস্তি ভোগ করছিলেন সনাতন মণ্ডল, জীবন ঢালী, জীবন শেখ প্রমুখ কৃষক।

বৈকালে কয়েকজন হিতাকাঙ্খী ও অনুরক্ত জমিদারের কাচারীতে গিয়ে ধলু সরদারকে ধরাধরি করে বাড়ী নিয়ে আসে। তখন ধলু সরদারের প্রাণ ওষ্ঠাগত প্রায়। তিনি বাড়ী ফেরার পূর্বে খাজনার দায়ে জমিদারকে জমিটা লিখে দিয়ে আসছেন। অসুস্থ শরীরে প্রাণপ্রিয় জমিটা লিখে দিয়ে বাড়ী ফিরলে তার শরীরের তাপমাত্রা দ্রুত বাড়তে থাকে। বুকের ধুক-ধুকানী ছাড়া সমস্ত শরীরই আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে আসতে থাকে। সুহৃদ ও গ্রামবাসী তাকে ফুঁফা দিয়ে, মাদুলী ও সুতা পরিয়ে, পথ্য খায়িয়ে, দু'দিন বাঁচিয়ে রাখার প্রাণান্ত প্রচেষ্টা নেন। কিন্তু তাদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে ধলু সরদার তার শেষ সম্বল জানটুকুও দিয়ে দিলেন। তিনি সম্ভবতঃ জমি দেয়ার পর জানটা দেয়াও সমীচীন মনে করছিলেন। এদিকে মাতৃহারা কন্যা আমেনা পিতার শেষ নিশ্বাসের সাথে সাথে আব্বারে—বলে চিৎকার দিয়ে ভিমরি খেয়ে পড়ে। ★★

উক্ত ঘটনার পূর্বে একদিন ঐ অঞ্চলের তদানীন্তন ক্ষুদে মোড়ল বাবু সতীশ চন্দ্র হালদার, তার বাড়ীর সম্মুখস্ত ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের রাস্তায়

☆/ ☆☆ বিষ্ণু চট্টোপাধ্যায়ের "শেভনা বাঁধ" শীর্ষক নিবন্ধঃ অমর কৃষক নেতা বিষ্ণু চট্টোপাধ্যায়।

পায়চারি করছিলেন। এমন সময় বড় মিয়া "কামদার সরদার" ★ এগিয়ে গিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরেন। বড় মিয়ার তখন দু'চোখ বেয়ে শুধু অশ্রুই ঝরছিলো। তিনি কিছুতেই বলতে পারছিলেন না। পরে জানা গেলো যে, জমিদার তাকে ধরে নিয়ে তার নৌকার পায়-খানায় আটকে রাখছিলেন। সে অপমানে তিনি লোককে আর মুখ দেখাতে পারছিলেন না। বাবু সতীশ চন্দ্র হালদার তাতে দারুণ ভাবে মর্মাহত হন এবং স্থানীয় কৃষকদের নিয়ে জমিদার বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলেন। তখন তার বয়স ছিল সবে আঠার বছর। ঐ অল্প বয়সে তার কৃষক আন্দোলন করার মূলে যে প্রেরণা যোগিয়েছে—তার মুখেই শোনা—তা হলো: একদিন তিনি খবরের কাগজে দেখলেন যে, একরাতে সাম্যবাদী দলের সাত-আট জন লোক মাদ্রাজের এক ধানী পরিবারের সবাইকে খুন করে সোনা-দানা, টাকা-পয়সা নিয়ে চলে গেছেন। সে থেকেই তার বিশ্বাস জন্মেছে যে, সমাজতান্ত্রীক দেশ ছাড়া মানুষ সুষ্ঠভাবে বসবাস করতে পারেনা। আর তারপর থেকে তিনি পড়তে আরম্ভ করেন—ছোটদের রাজনীতি, বড়দের রাজনীতি, পার্টি পুস্তক ইত্যাদি। তার পরের কথায় পরে আসছি। এখানে বলে রাখা যায় যে, পরবর্তীতে তিনি ৯ বছর জেল খাটা কালে ঢাকা জেলে সাজা-প্রাপ্ত ৯০ বছরের বেচাগাজী, ৬৩ বছরের রমেশ মিত্র প্রমুখের সাথে মিশে এ সমাজ ব্যবস্থার তীক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন।

অধুনা অনেকে বিরক্তহয়ে "তোর ভিটায় ঘুঘু চরুক" বলে অভিসম্পাদ দেয়। সে অভিসম্পাতের বস্তুগত কোন মূল্যে আছে কিনা জানিনে, তবে আলোচ্য সময় বছরের পর বছর জমিতে ফসল না ফলায় সেখানে প্রচুর পাখীর সমাবেশ ঘটতো। যেমন সাদা ও কুচি বক, সড়াই, নাড়িন, দিঘা ইত্যাদি। দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত কিছু কিছু কৃষক বহু

☆ সম্ভবতঃ ইনিও পূর্বোক্ত ধলু সরদারই হবেন। কিন্তু আশিতি-পর বৃদ্ধ সতীশ হালদার পুনঃ পুনঃ এর নাম বলেছেন "কামদার সরদার"।

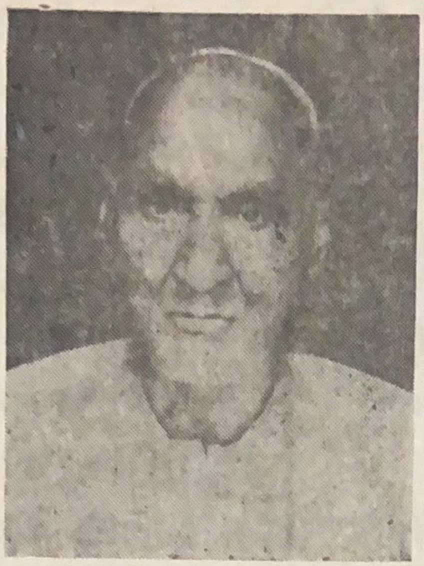

সতীশ চন্দ্র হালদার

পরিশ্রম করে ঐ পাখী ফাঁদে ফেলে বা জাল দিয়ে ধরে পরিশ্রম আত্ম-শ্লাঘৎকারী শহুরে ভাগ্যবানদের কাছে বিক্রয় করে জীবিকা নির্বাহ করতো। আর খালের ধারে বা শাখা নদীর পাশ দিয়ে দশ-বার হাত জুড়ে উচু জমিতে সামান্য কিছু ধান ফলতো। অবশিষ্ট বিশাল মাঠ জুড়ে হতো পাতি ঘাস (মাইলে) বন, কাঁটা (কেয়া) বন, ওড়া আর কেওড়া গাছ, ইত্যাদি।

যেবার বর্ষা কম হতো বা আদৌ না হতো, সেবার লোনার আধিক্য বৃদ্ধি পেতো। সে লোনা জলে খালের পাড় ঘেঁষে জন্মাতো প্রচুর মাইলে বন। সে মাইলে দিয়ে অপর কিছু বেকার কৃষকগিন্নী মাদুর তৈরী করে জীবিকা নির্বাহ করতো। ইংরেজ আমলে খুলনা—ইল্লাচর জাহাজ লাইনে সে মাদুর ও সুটকী চিংড়ি রপ্তানী হতো খুলনা। আর সেখান থেকে জাহাজ ও রেল পথে চালান হতো দূর দূরাঞ্চলে। সে মাদুর পুনরায় জাহাজ যোগে চিটাগাং হয়ে যেতো বার্মা, আর ট্রেন যোগে কলকাতা হয়ে যেতো মধ্য ভারতে। আজ সে লোনা বিলুপ্তির সাথে সাথে ঐতিহ্যবাহী সে মাদুর শিল্পও বিলুপ্ত প্রায়।

এদিকে শাখা নদীগুলিতে তখন প্রচুর পরিমাণে ভাংগন, ফাসিয়া, গলদা চিংড়ি প্রভৃতি মাছ পড়তো। জমিতে ফসল না ফলার দরুণ কিছু বেকার কৃষক বাঁচার তাগিদে পৈত্রিক পেষা ছেড়ে তখন মাদুর বোনা, পাখী শিকার, মাছ ধরা, জনখাটা প্রভৃতি কাজে নিয়োজিত হতো। পূর্বে ঐ অঞ্চলে যে জমির মূল্য ছিল বিঘা প্রতি দেড় শ'টাকা, তখন তা নেমে আসে দশ-বিশ টাকায়। এতদসত্তেও অধিকাংশ কৃষকই সুদি-

নের আশায় নিজ নিজ জমি হাতছাড়া করতে চায়নি। তারাও এক দিন দেখলো, জমিদারের লোকজন এসে ঢোল সহরত করে কোন না কোন কৃষকের ঘরের চাল কেটে, থালা-ঘটি-বাটি লুট করে খাজনার দায়ে গৃহ ছাড়া করছে। তখনই জানাজানি হয়ে পড়ে যে, জমিদার কোর্টের নোটিশ গায়েব করে তলে তলে একতরফা ডিক্রী করে জমি খাস করে নিয়েছেন।

পূর্বোল্লিখিত পন্থায় কৃষক উচ্ছেদ ও জমি খাস করার পেছনে হৃদয়হীন জমিদারদের ছিল বহুবিধ স্বার্থ। প্রজাদের কাছ থেকে যে পরিমাণ জমিতে খাজনা পাওয়া যেতো দেড়-দু'টাকা, সে পরিমাণ জমিতে মহিষ চরান বা মাইলে ঘাসের জন্য ইজারা দিলে পেতো তার অন্ততঃ দশ-গুণ অধিক টাকা। আবার তারও দশ-বিশ গুণ অধিক টাকা পাওয়া যেতো খাল বা শাখা নদীতে মাছ ধরার ইজারা দিলে। তাই জমিতে ফসল হলো কি হলোনা, বা চাষী মরলো কি বাঁচলো, তা ভাবার মত ফুরসত লোভী জমিদারদের ছিলনা। বস্তুতঃ দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত চাউলের দাম ছিল মণ প্রতি পৌনে চার-চার টাকা মাত্র।

সে সময়নোয়া পাড়ার ঘোষ, আর সাজিয়ারার ভট্টাচার্যীদের জমিদারী ক্রমশঃ বেড়েই চলছিলো। আদতে এরা ছিলেন গাঁতিদার। ঐ গাঁতির সাথে তাদের ছিল সুদের ব্যবসা। শতকরা পয়ত্রিশ টাকা ছিল সে সুদের হার। আবার ছ'মাস অতিবাহিত হলেই সে সুদ চক্র-বৃদ্ধি হারে বেড়ে যেতো। ঐ অঞ্চলের প্রকৃত জমিদার বলতে ভাগ্য-কুলের জমিদারকেই বুঝায়। অবশ্য আলোচ্য এলাকা তার জমীদারীর আওতাধীন ছিলনা। ★

☆ সাহস পরগনা—চালনা থেকে ডুমুরিয়া পর্যন্ত—পূর্বে ছিল চাঁচড়ার রাজাদের জমিদারী। পরবর্তীতে উক্ত জমিদারীর এক তৃতীয়াংশ কেনেন যশোরের কালী ঘোষরা। আর ঐ এক তৃতীয়াংশের কিয়দাংশ পরবর্তীতে শৈলেন ঘোষরা কিনে জমিদারী খাতায় নাম লেখান। আর ধীরেন—শিরিষ ভট্টাচার্যীদের তেমনটাও ছিলনা।

জমিদার না হয়েও গাঁতিদার, পত্তনিদার, দর-পত্তনিদারগণ এতদাঞ্চলে জমিদারী ডাটেই চলতেন। গরীব কৃষকগণও তাদেরকে জমিদার বলেই জানতো। অতএব বক্তব্যের সহজ অনুধাবনের জন্য আমারাও পরবর্তীতে তাদেরকে জমিদার বলেই উল্লেখ করবো।

যাক সে সব কথা। ফসল হানীর সে ঘোর অমানিশায়, কৃষক উচ্ছেদের দুর্দিনে, কে সে মহা মানব যিনি কৃষকদের পার্শ্বে এসে দাড়িয়ে ছিলেন? আর কি সে জিয়নকাঠি যার পরশে উপরোক্ত বন্ধা জমি শুধু সুজলা—সুফলাই নয়, বলা যায়, দস্তুর মত সোনা ফলেছে—এবার তারই বিশদ আলোচনায় আসা যাক। তবে আলোচনার সুবিধার্থে তার ফাঁকে পরবর্তী অনুচ্ছেদে এতদাঞ্চলের ভূমি ব্যবস্থা ও খাজনা আদায়ের পূর্ব পর প্রনালীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া প্রয়োজন।

ভূমি ব্যবস্থা ও খাজনা আদায়ের পূর্বাপর প্রণালী

হিন্দু শাসন আমলে ভারতবর্ষের রাজন্যবর্গ রাজস্ব হিসাবে ফসলের এক সষ্টাংশ গ্রহণ করতেন। আর পাঠান (শের শাহের) আমলে চৌথা অর্থাৎ এক চতুর্থাংশ ফসল আদায় হতো। পরবর্তী মোগল আমলে বাদশাহগণ রাজস্বের হার আরও বাড়িয়ে ফসলের এক তৃতীয়াংশ আদায় করতেন আঞ্চলিক মুদ্রায়। মোগল সাম্রাজ্য যখন ভেংগে পড়ে, তখন থেকে ১৭৮১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত যশোর—খুলনায় প্রকৃত কোন শাসনই ছিল না। ঐ সময় নবাবী শাসনের অবসান ঘটেছিল, কিন্তু তার পরিবর্তে কোন শাসনই আসেনি। আর তাই গোমস্তা, জমিদার—জায়গীরদার—সামন্তগণ যেখানে যা পেতো তাই

লুট করে নিতো। চাষীরা ফসলের অধিকাংশ দিয়েও অব্যাহতি পেতোনা।

ইংরেজ শাসকগণই প্রথমতঃ গ্রাম সমাজের নিকট রাজস্ব আদায়ের প্রথা বিলোপ করে কৃষকদের নিকট থেকে ব্যক্তিগত ভাবে রাজস্ব আদায়ের প্রথা প্রচলন করে। বলা বাহুল্য যে, ইংরেজ পূর্ব হিন্দু বা মুসলিম শাসন আমলে জমির উপর প্রজাদের কোন ব্যক্তি মালিকানা ছিলনা। দ্বিতীয়তঃ মুদ্রাই ইংরেজদের রাজস্ব আদায়ের এক মাত্র গ্রহণ যোগ্য রূপ হলো। ★

ইংরেজরাই প্রথমতঃ জমির উপর মালিকানা দিয়ে জমিদার তৈরী করে (পূর্বে তারা কেবল মাত্র খাজনা আদায়কারী বা ট্যাক্স কালেক্টর ছিলেন)। ইংরেজ আমলেই ঐ জমিদারগণ বিভিন্ন অঞ্চলে গাতিদার, পত্তনিদার, দর-পত্তনিদার তালুকদার নামে উপসত্ব দেয়।

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে মোগল বাদশাহ শাহ্ আলমের কাছ থেকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী গ্রহণ করে। এমনি করেই আমাদের মনিবদের হাত বদল হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই জনতার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন তোয়াক্কাই করা হয়নি।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, বিপ্লব পূর্ব যুগে চীনের জাতীয় বুর্জোয়ারা বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রকে তাদের দেশে ব্যবসা করে লুট করতেই শুধু সুযোগ দেয়নিঃ ফ্রান্স, বৃটেন প্রভৃতি দেশকে সৈন্য রাখতেও সুযোগ করে দিয়েছে।

যাক, পূর্বোল্লিখিত দেওয়ানী লাভের পর পরই ইংরেজ বণিক মনিব সেজে শোষনের সুবিধার্থে নূতন নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে নূতন করের ভিত্তিতে জমিদারদের পাঁচশালা বন্দোবস্ত দেয়া হয়। তৎপূর্বে বছর ওয়ারী বন্দোবস্ত হতো। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে গভর্ণর জেনারেল কর্ণওয়ালিস নূতন বর্ধিত কর ধার্য করে দশ শালা

★ সুপ্রকাশ রায়ঃ ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন।

বন্দোবস্ত দেন। আবার ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনিই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন। সে সময়ই কোম্পানী জমির উপর জমিদারের অধিকার ন্যাস্ত করে।

উল্লেখ্য যে, সে সর্বনাশা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিবিধ কুফলের সমালোচনা যখন এ দেশের তদানীন্তন পদস্থ ইংরেজ কর্মচারী স্যার জন শোর প্রভৃতিও করছিলেন, তখন এদেশের রাজা রামমোহন রায় যাকে—আমরা মনিষী, অনন্য সমাজ সংস্কারক ইত্যাদি বিশেষনে ভূষিত করে থাকি—তার Rights of Hindu over Ancestral property গ্রন্থে লিখেছেন: সম্পত্তির (ভূসম্পত্তির) উপর ব্যক্তিগত অধিকারের যে ব্যবস্থা (চিরস্থায়ী ব্যবস্থা) বর্তমানে রয়েছে তা কোন প্রকারেই লংঘন করা উচিৎ নয়। ★

প্রসংগত বলা যায় যে, বর্তমানেও কোন শাসক যখন জনগনের ক্ষতি কারক অনুরূপ কোন ফরমান জারী করেন, তখনও দেখা যায় যে কোন না কোন দালাল অনুরূপ সস্তা বিবৃতি দিয়ে বা লেখনী চালায়ে আমাদেরকে আষ্টে-পৃষ্ঠে আবদ্ধ করার তালে থাকেন।

যাক, প্রাসঙ্গিক বাড়তি বিবরণ বারান্তে দেয়া যাবে। এবার পূর্বোল্লিখিত মহান ব্যক্তি ও তার জীয়ন কাঠির আলোচনায় যাই।

আন্দোলনের সূচনা

শস্যহানী এবং তৎজনিত কৃষক কুলের ঐ দুর্যোগময় মুহূর্তে অর্থাৎ ১৯৩৮ সালে কামারের হাট খোলায়—বিশেষ করে চায়ের দোকানের সম্মুখের বেঞ্চে—বসে থাকতে দেখা যেতো নূতন এক আগন্তককে।

☆ সুপ্রকাশ রায়: ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন।

সাধারণ মানুষের সাথে তাঁর একাত্ম হবার বাসনা ছিল প্রবল। কিন্তু তার উজ্জ্বল চোখ, উন্নত নাক, পাতলা গড়নের লম্বা চেহারা, আর প্রত্যয় ব্যঞ্জক কথা বলার ভংগীতে ভূমিহীন ও স্বল্প ভূমি মালিক কৃষক-কুল তাঁকে আপন শ্রেণীর লোক বলে বিশ্বাস করতে পারেনি। উল্লেখ্য যে, সে সময় বছরের পর বছরের সর্বনাশা শস্য হানীতে বিত্তহীন আর মধ্যবিত্ত একাকার হয়ে যায়। অর্থনৈতিক ঐ দুর্গতির দরুণ জনসাধারণ দারুণভাবে আত্ম-স্বার্থকেন্দ্রীক ও পরস্পর সন্দিগ্ধমনা হয়ে পড়ে।

আগন্তুক ভদ্রলোক চা খেতেন, আর চাষীদের মতই পাতার বিড়ি খেতেন ঘন ঘন; কথা বলতেন খুবই কম। তবে যখন বলতেন, তখন তাতে থাকতো দারুণ প্রত্যয়। সন্দিগ্ধমনা দু' একজন কৃষক নিজ নিজ ভংগীতে তাকে টোকা মেরে জানলেন যে, তিনি নাকি খানকার ★ শ্রী রাধাচরণ চট্টোপাধ্যায় জমিদার নন্দন। "জমিদার-নন্দন" শুনেই লোকে বেশ একটু আতকে ওঠে। কারণ ইতিপূর্বে তারা দু'দু' জন জমিদারের নির্যাতনে ভিটে ছাড়া—লক্ষীছাড়া-সর্বহারা হয়ে পড়েছে। তাই তারা ভাবে, এ আবার কোন জমিদারের আগমণ? আর সে আগমনের হেতুই বা কি? আরও ভাবে, নোয়াপাড়ার ঘোষদের ন্যায় তিনিও হয়তো কোন না কোন উর্বর জমি ক্রয়ের ফন্দিতেই আছেন। পরে সিদ্ধান্তে আসে যে, দেখাই যাকনা কেন—কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাড়ায়।

কিছু দিন পর তার সম্পর্কে আরোও কিছু জানা গেলো। তিনি নাকি ইতিপূর্বে খুলনায় দক্ষিণ—কুমার খালি, সুতার খালি অঞ্চলেও কিছু দিন ছিলেন। পরে আরও জানা গেলো যে, তাঁর

★ তাঁর বাড়ী সামন্তসেনা। লোকে খানকার জমিদার বললেও আদতে তাঁদের খানকার বাড়ী বহু পূর্বেই নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে।

মাতুলালয় নাকি ভাণ্ডারপাড়া। মাতুল বিধুভূষণ চক্রবর্তী, ★ শোভানার অনতি দূরেই সে গ্রামে।

ভদ্রলোক কৃষকদের সাথে যতই একাত্ম হবার চেষ্টা করেন, সর্বহারা কৃষককুল তাদের স্বভাব সুলভ সন্দিগ্ধতার কারণে ততই তার থেকে দূরে থাকতো। বাইরে লোক দেখান কিছু কিছু মেলা-মেশা করলেও অন্তর থেকে তারা তাঁকে গ্রহণ করতে পারেনি। জমিদারী ছাড়াও কৃষকগণ তখন তাকে আপন বলে গ্রহণ করতে না পারার অপর কারণ ছিলো: তিনি হলেন "চ্যাটার্জী", অর্থাৎ কুলীন ব্রাহ্মণ। ইতিপূর্বে তারা দুই কুলীন-ঘোষ ও ভট্টাচার্জীদের স্বরূপ দেখেছেন। ঐ কৌলীন্যের আবরণে নিম্ন, এমন কি বিত্তহীন উচ্চ শ্রেণীর লোকদেরকেও যে কি অকল্পনীয় শোষণ ও নির্যাতন করেছেন তারা তার প্রমাণ ইতিমধ্যেই হাড়ে হাড়ে পেয়েছে। তা ছাড়া তাদের ঐ উচ্চ শিক্ষা আর সৈম্য মূর্তির আবরণে অশিক্ষিত কৃষকদেরকে যে কি হীণ ভাবে পরষ্পরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছেন, তাও তারা সম্যক উপলব্ধি করেছে।

এদিকে যতোই দিন যায়, ততোই অধিক হারে লোক তাঁর গা ঘেসলেও তার জমিদারী আর কৌলীন্যের কথা স্মরণ করে তারা দূরেই থেকে যায়। সে সময় তাঁর খাওয়া-দাওয়ার কোন নির্দিষ্ট স্থান ছিলনা। পরে স্থানীয় সতীশ চন্দ্র হালদার তাঁকে আশ্রয় দেন। ঐ সতীশ হালদার প্রচুর জমির মালিক হলেও ঐ সময়ের বছর পরম্পরা ফসল হানীর দরুণ আর্থিক দিক দিয়ে তিনিও ভূমিহীন কৃষকদের পর্যায়ে পড়েছিলেন। আর তিনি যে স্থানীয় কৃষকদের নিয়ে ইতিপূর্বে জমিদার বিরোধী আন্দোলনের ভিত গড়ে তুলেছিলেন তাতো প্রথম

☆ মাতুল আদুরে ভাগনের জন্য সেখানে দক্ষিণ পোতায় একটি দ্বিতল অট্টালিকা করে দিয়েছেন। সে অট্টালিকায় সুধান্দাকে নিয়ে তিনি বহু রজনী একান্তে কাটিয়েছেন।

অধ্যায়েই উল্লেখ আছে। সেই সতীশ হালদারের আস্তানায় ছয়—সাত মাস থাকা কালে ভদ্রলোক কৃষকদের সাথে স্থানীয় সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতেন। কিন্তু পূর্বোক্ত কৌলীন্যের কারণে কৃষকগণ তখনও তার সাথে তেমন নিবিড় ভাবে মিশতোনা। সে অবস্থায় আরও একাত্ম হবার মানষে তিনি তাঁর বিচরণ ক্ষেত্র কামারের হাটখোলা থেকে শরনিয়া হয়ে চুকনগর পর্যন্ত বিস্তৃত করেন।

ইত্যবসরে—সম্ভবতঃ নভেম্বর/ডিসেম্বরে—চুকনগর হাটখোলায় টকি কোম্পানী টিকেটে বাইসকোপ দেখাচ্ছিল। ঐ বাইসকোপের টিকেট কিনতে গিয়ে নিঃস্ব কৃষক-সন্তান পিতা-মাতার শেষ সম্বল থালা-ঘটি বাটি বিক্রয় করে একদম সর্বহারায় পরিনত হচ্ছিল।

বলাবাহুল্য যে, অভাব অনটন ও ক্ষুধার কথা জনসাধারণ সাময়িক হলেও যাতে ভুলে থাকে তার জন্যই ঐ ঘোর দুর্দিনে টকি বাইসকোপ দেখাবার যে হীন কৌশল ইংরেজ শাসন আমলে ছিল, অধুনা অর্থনৈতিক দুর্দিনে সেই একই কৌশলে প্রদর্শনী, আনন্দমেলা, কার্নিভাল, মিনা বাজার চিত্র তারকাদের ক্রিকেট ম্যাচ, ফুটবল ম্যাচ (এখানে নির্মল আমোদ-প্রমোদের কথা হচ্ছেনা) দেখাবার প্রবনতা প্রচুর পরিদৃষ্ট হয়ে থাকে।

উল্লেখ্য যে, একদা রোমের অভিজাতরা দাসদের সিংহ, বাঘ, প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর সাথে খেলতে বাধ্য করতো। দাস ও পশুর দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে হয় পশু, নয়তো দাস মরতো। এরূপ ক্রীড়ানুষ্ঠানের বন্দোবস্ত করা হতো রোমান নাগরিকদের স্ফূর্তি ও আনন্দের জন্য। যে দাসদের ঐ সর্বনাশা খেলায় যোগদিতে বাধ্য করা হতো অভিজাতরা তাদেরকে গ্লেডিয়েটর বলতো। ★

যাক, সে সব কথা। স্থানীয় কৃষকদের ঐ ঘোর দুর্দিনে ভদ্রলোক মুষ্টিমেয় সংগী-সাথী নিয়ে উক্ত বাইস কোপের প্যাণ্ডেলের

☆ রেবতী মোহন বর্মন: সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ।

সামনে গিয়ে—"টিকেটে টকি দেখান চলবে না, বাইসকোপ বন্ধ কর" ইত্যাদি বলে বজ্র হুঙ্কার ছাড়েন। এতে কায়েমী স্বার্থবাদীরা প্রথমতঃ একটু হক—চকিয়ে পড়ে। কারণ, ইতিপূর্বে তাদের সে লুন্ঠন প্রক্রিয়ায় কেউ এমন প্রতিবাদ করেনি; করতে সাহসও পায়নি। সে কায়েমী লুন্ঠন বন্ধ হওয়ার সমূহ সম্ভাবনায় তারা তখন মারিয়া হয়ে তাঁর মাথা ফাটিয়ে দেয়। মাথার সে যখম সারতে ভদ্রলোকের বেশ কয়েক মাস সময় লাগে। তবে তাঁর ঐ প্রথম প্রতিবাদ ও মাথার জখম দেখে কৃষককুল তাঁকে আপনার করে টেনে নিতে আরম্ভ করে। কারণ তারা উপলব্ধি করলো যে, ভদ্রলোক তাদের স্বার্থে কাজ করতে গিয়েইতো মাথা ফাটিয়েছেন।

তাই এতদিন যে জনসাধারণকে তিনি তাঁর দিকে টানতে সচেষ্ট ছিলেন, তখন থেকে সে জনসাধারণই তাঁকে তাদের দিকে টানতে লাগলো। আর এ ভাবেই তাদের একাত্মতা ঘটলো দ্রুততর গতিতে। আর এতদিন যিনি ছিলেন "বিষ্ণু চ্যাটার্জী" এখান থেকে তিনি হলেন "বিষ্টু ঠাকুর"। হিন্দুদের বিশ্বাস, তিনি নিশ্চই ঠাকুরই বটেন। ঠাকুর না হলে কি কেউ পরের জন্য এভাবে মাথা দিতে পারেন? বলাই বাহুল্য যে, বিষ্টু ঠাকুরের সে আন্দোলনে সে যাত্রায় সে অঞ্চলে টকি দেখান বন্ধ হয়েছিল।

এদিকে তিনি একটু সুস্থ হয়ে ঐ চুকনগর বাজারেই তোলা বিরোধী আন্দোলন শুরু করেন। আর এদিকে তদানীন্তন সরকারও ইত্যবসরে বিষ্ণুদার (সহপাটি ও সম-বয়সী সাধারণ লোকে তাকে বিষ্ণুদা বলেই ডাকতো। অতঃপর আমরাও তাঁকে বিষ্ণুদা বলেই সম্বোধন করবো) বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে ওঠে।

ইতিপূর্বে সন্ত্রাসবাদী আইন-অমান্য আন্দোলনে শরীক হওয়ায় ১৯৩০ সালের ২রা মে পুলিশ তাঁকে আটক করেছিল। সেবার তাঁকে বিনা বিচারে Detenue হিসাবে বক্সা ক্যাম্প ও অন্যান্য কারাগারে

দীর্ঘ আট বছর আটক রাখে। ঐ সময় প্রখ্যাত মার্কস্‌বাদী নেতা আব্দুর রাজ্জাক খাঁও ঐ বক্‌সা ক্যাম্পে ছিলেন। সে সুযোগে উভয়ের মধ্যে যোগসূত্র হয়। অবশ্য ইতিপূর্বে সম্ভবতঃ সামন্তসেনার প্রমথ ভৌমিকের কাছেও তিনি মার্কসীয় দর্শনে অনুপ্রেরণা পেয়ে থাকবেন। তা ছাড়া তাঁর বংশেরই একাধিক ব্যক্তি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রণীর ভূমিকা পালন করেছেন। তাদের মধ্যে কিশোরী মোহন চট্টোপাধ্যায়, বলরাম চট্টোপাধ্যায়, রামপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, নারায়ন চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমতি ভানু দেবী (ভানুদি)—এর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখের দাবী রাখে।

সে সময় থেকেই বক্‌সা ক্যাম্প ও অন্যান্য জেলে মার্কসবাদী সাহিত্য আসতে থাকে। ★ তিনি সে সব সাহিত্য পড়ে শীগ্রই বৈজ্ঞানিক মার্কসীয় দর্শনে আকৃষ্ট হন এবং মার্কসবাদী পার্টিতে যোগ দেন। ইতিপূর্বে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি খালিশপুরে অনুশীলন পার্টির স্বরাজ আশ্রমে আশ্রম জীবন যাপন করেন। সে আশ্রম বাসীদের আদর্শ ছিল আত্ম নির্ভরশীলতা। তারা নিজেরাই জমি চাষ করতেন এবং উৎপাদিত ফসল মাথায় করে হাট বাজারে নিয়ে বিক্রয় করতেন। বস্তুতঃ সে আশ্রম জীবনের অভ্যাসই তাঁকে কৃষকদের সাথে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ করে দেয়। খালিশপুরের আশ্রমে থাকাকালে তাকে

☆ ঐ সব কারাগারে মার্কসীয় গ্রন্থ আমদানীকে মার্কসবাদীরা তদানীন্তন ইংরেজ সরকারের নতী স্বীকার বা নমনীয় আচরণে বাধ্য হয়েছে ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করতেন। আদত ঘটনাটা হলো এই যে, সে সময় সন্ত্রাসবাদীদের কর্মকাণ্ডে ইংরেজগণ অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। আর তাই তাদেরকে অন্ততঃ মার্কসীয় দর্শনের আওতায় এনে চলিত উচ্ছৃংখলতা প্রতিহতের এটা ছিল সাময়িক একটা প্রচেষ্টা মাত্র। আর সে কৌশলও ততদিন পর্যন্তই চলতে দেয়া হয়েছে, যতদিন পর্যন্ত ইংরেজ সরকারের স্বার্থের সামান্যতম ক্ষতি হয়নি।

ও কালিপদ ঘোষ এবং দলের অপরাপর কয়েকজনকে সন্দেহের বসে পুলিশ ডিটেন্‌শন্‌ আইনে আটক করে। তিনি সে সময় তিন মাস আটক ছিলেন। এ সব কারণেই এবারের তোলা বিরোধী আন্দোলনে দারোগা তার চৌকিদার ও জমাদার নিয়ে বিষ্ণুদাকে মুখামুখী বাধা দেয়। তবে মজার ব্যাপার এই যে, সে বাঁধা দিতে গিয়ে দারোগার দাঁত যায় উপরে, চৌকিদার হয় নিমখুন, আর জমাদারের মাথায় এমন প্রচণ্ড লাঠির আঘাত হানা হয় যে, সামান্য লক্ষ্য ভ্রষ্ট না হলে তাকে তৎক্ষণাতই অক্কা পেতে হতো।

এদিকে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির জাতীয় কংগ্রেসে পার্টি কর্মীদের জাতীয় কংগ্রেসে ঢুকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংযুক্ত মোর্চায় রূপান্তরিত করার কর্মসূচী নওয়া হয়। পরবর্তীতে অবশ্য সে কর্মসূচী ভুল বলে প্রমানিত হয়েছে। এতদসত্ত্বেও তার পরবর্তী ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে সে পার্টি আওয়ামীলীগ আর পরবর্তীতে ন্যাপে ঢুকে অনুরূপ ভুলের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছে, ঈষৎ অপ্রাসংগিক বিধায় এখানে তার বিশদ ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

উক্ত পার্টির নির্দেশেই বিষ্ণুদা ১৯৩৮ সালে কংগ্রেসী হন। তবে পার্টির নির্দেশে তাঁকে কংগ্রেসে যোগ দিতে হলেও মার্কসীয় দর্শনের নিষ্ঠাবান কর্মী হিসাবে কৃষক সমিতি গঠনের উদ্দেশ্যে তিনি শোভনায় চলে যান। উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে কৃষক সমিতির মৌভোগে প্রথম জেলা সম্মেলনে "লাংগল যার, জমি তার" —এ শ্লোগান ওঠে। তিনি অচিরেই শোভনায় একটি কৃষক সংগঠন দাড় করান এবং ১৯৩৯ সালের এপ্রিল মাসে শোভনায় দ্বিতীয় জেলা কৃষক সম্মেলন করেন। উক্ত সম্মেলনের প্রধান উদ্যোক্তাও ছিলেন তিনিই।

সে সম্মেলনটি হয়েছিল নেপাল বশাকের বাজারের মাঠে। উক্ত সম্মেলনে সারা ভারত কৃষক সভার পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ কমিউনিষ্ট নেতা বঙ্কিম মুখার্জী, প্রখ্যাত জাতীয়তাবাদী মুসলিম বাগ্মী

সৈয়দ নওশের আলী ও মাওলানা আহম্মদ আলী। সে সম্মেলনে পনের হাজার হিন্দু—মুসলিম কৃষক উপস্থিত হয়েছিল।

উক্ত সম্মেলনে বাঁধ বেঁধে পতিত জমি উদ্ধার করা, আর সে উদ্ধার করা জমি কৃষকদের—বিশেষ করে পূর্বে উচ্ছেদকৃত কৃষকদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে—বিলি বন্টনের প্রস্তাব পেশ হয়। সম্মেলনে আওয়াজ ওঠ "বে-আইনী প্রজা উচ্ছেদ বন্ধ কর, বন্ধ কর।" আর তাতে কৃষকদের মনে বিরাট এক আশার সঞ্চার হয়।

বঙ্কিম মুখার্জী ছাড়াও পশ্চিম বংগের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুও ১৯৪০/৪১ সালে তদানিন্তন প্রাদেশিক নেতা হিসাবে কৃষক সমিতি গঠন কালে শোভনায় আসেন। তখন তার সাথে ছিলেন ভানুদি। জ্যোতি বসু সেবার যোগেন্দ্র নাথ মোড়লের বাড়ী ওঠেন। সেখানেই খাওয়া দাওয়া সেরে শোভনা স্কুল মাঠে একটি জনসভা করেন। অতঃপর ১৯৪৬ সালে পুলিশের গুলীতে হাজরা পদ মারা গেলে পার্টি নির্দেশে সে গুলী বর্ষণ ঘটনার তদন্তের উদ্দেশ্যে তিনি পুনরায় জীয়লতলা আসেন।

অভয় চরণ জোয়ারদার

সেবার মনাঘোষের গড়িতে করে তাকে ডুমুরিয়া পর্যন্ত এগিয়ে দেয়া হয়। তখন তাঁর সাথে ছিলেন মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির চারুলতা ঘোষ ও আরও অনেকে। সেবার তিনি উঠেছিলেন অভয় চরণ জোয়ারদারের বাড়ী। তথায় খাওয়া দাওয়ার পর জনসভা হয় জীয়লতলা মাঠে। জ্যোতি বসু ছাড়া অপরাপর খ্যাতিমান ব্যক্তি যারা আগে পরে শোভনায় এসেছেন তারা হলেন-আব্দুল হালিম, ভবানী সেন, কৃষ্ণ বিনোদ রায় প্রমুখ।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, জেলা সম্মেলনে বিষ্ণুদার প্রস্তাবে কৃষকদের উদ্যোগে বাঁধ বাঁধার সিদ্ধান্ত নিলেও সম্মেলনে উপস্থিত নেতৃস্থানীয় অনেকেই তখন বাঁধ বাঁধার শ্লোগানকে প্রচারের স্তরে রাখাই শ্রেয় বিবেচনা করছিলেন। তাদের বিবেচনায় প্রভাবশালী জমিদারদের প্রজা উচ্ছেদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নামার পরিপক্ক সময়ও সেটা নয়। আর তাই তাদের ধারণায় এতে কৃষকদের জয় লাভের সম্ভাবনাও নেই। কিন্তু বিষ্ণুদার কথা ও কাজের মধ্যে কোন ফাঁক ছিল না। তিনি একবার যে সিদ্ধান্ত নিতেন, তা বাস্তবায়িত করেই ছাড়তেন। অবশ্য প্রতিটি সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বে তার বাস্তবতা তিনি বার বার পরীক্ষা করে নিতেন। তার ঐ প্রজ্ঞার জন্য পার্টি হটকারিতামূলক যে সব সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তিনি তার বিরুদ্ধাচারণ না করে নিজ দূরদৃষ্টি দিয়ে বাস্তব ভিত্তিক কাজ করে গেছেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, ১৯৪৬ সালে মৌভোগের প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনে কৃষকদের তেভাগা-আন্দোলনের—প্রাসঙ্গিক অন্যান্য খবর অন্যত্র দেয়া হলো— যে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, তার পক্ষে বা বিপক্ষে না গিয়ে সে সময় এতদাঞ্চলের জমিদারদের দ্বারা যে অসংখ্য কৃষক উচ্ছেদ হয়েছে এবং যে হাজার হাজার বিঘা জমি খাস করা হয়েছে, তিনি সে উচ্ছেদকৃত চাষীদের জমি পুনর্দখল আর সে জমির ধান কেটে কৃষকদের খামারে তোলার আন্দোলন করেন। লক্ষনীয় যে, সে সময় এমন কি এখনও শহুরে পার্টি তাত্ত্বিকগণ শহরে বসে যে সব তত্ত্ব কপচান, তিনি তা না করে কৃষকদের সাথে একাত্ম হয়েছেন এবং তাদেরকে সাথে নিয়েই ঘোর অমানিশা কাটিয়ে ওঠার কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ছিলেন।

ভাবতেও অবাক লাগে যে, কোন ফসলের ক'টা চাষের প্রয়োজন, কোন বীজ কখন বপনের প্রকৃষ্ট সময়, গরুর কি রোগে কি খাওয়াতে হয়, কোন প্রক্রিয়ায় ভিতরের বীচ ফেলে দিলে মিষ্টি কুমড়া দেড়

মণ পর্যন্ত ওজনের হতে পারে ইত্যাদি বিষয়ে জমিদার নন্দন কেবল অভিজ্ঞই ছিলেন না, দস্তুরমত পারদর্শীও ছিলেন।

যাক সে সব কথা। এযাবৎ সতীশ চন্দ্র হালদার, অভয় চরন জোয়ারদার প্রমুখ বিত্তবান ব্যক্তিই বিষ্ণুদার আশ্রয় ও আহার জুগিয়ে আসছিলেন। দ্বিতীয় জেলা কৃষক সম্মেলনের পর থেকে তারা ছাড়াও ত াঁর আশ্রয় ও আহার যুগিয়ে ছিলেন— মণিন্দ্র, হরি, কিরণ মল্লিক, হাজারী মল্লিক, সন্যাসী মণ্ডল, অভয়চরণ সরদার (মাল) প্রমুখ।

উক্ত সম্মেলনের প াঁচ মাস পরে সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধে। সে সময় পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ আইন জারি হয়। কৃষক লাভজনক বিবেচনা করলে তার জমিতে পাট চাষ করবে বৈকি— এইতো আইন! কিন্তু উক্ত পাট আইনে বিধান করে দেয়া হয়েছিল যে জমিতে পাট চাষ করতে হলে সরকারের কাছ থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে। সে লাইসেন্স সংগ্রহ করতে যে কি ঝকমারী পোহাতে হয় তা ভুক্তভোগী মাত্রই অবহিত আছেন। কৃষকদের মংগলে আসুক কি নাই আসুক, সরকার বললেই আইন। উপরোক্ত পাট আইনটিও অনুরূপ একটি বেআইনী আইন।

বিষ্ণুদা সে সময় ঐ পাট আইন বিরোধী আন্দোলনে বিভিন্ন সভা করতে থাকেন। ত াঁর বিরুদ্ধে হুলিয়া জারী ছিল। ১৯৩৯ সালের শেষ দিকে ঐ পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ বিরোধী আন্দোলনের জন্য সরকার তাঁকে এবং রসিক লাল মল্লিক, নকুল মল্লিক, অনিল মল্লিক প্রমুখ আঠার জন কর্মী ও নেতাকে বন্দী করে★। তিন মাস সশ্রম কারাবাসের পর তাদেরকে মুক্তি দেয়া হয়।

☆ মতান্তরে প্রকাশ, পাট আইন বিরোধী আন্দোলনে তাদের বিরুদ্ধে হুলিয়া ছিল বটে কিন্তু বন্দী হয়নি। পরবর্তীতে মহান মে—দিবস পালন উপলক্ষে তাদেরকে ভারত-রক্ষা আইনে আটক করে।

শাখাবাকী বাঁধ নির্মাণ

তিনমাস সশ্রম কারাভোগের পর বিষ্ণুদা তার কর্মক্ষেত্র শোভনায় চলে আসেন এবং দ্বিতীয় জেলা কৃষক সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কৃষকদের বাঁধ-বন্ধি দেয়া ও বে-আইনী প্রজা উচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলনে ব্রতী হন।

ঐ বাঁধ-বাধার কাজটি ছিল খুবই দুরূহ। কারণ নদীতে বাঁধ-বাঁধার বিরুদ্ধে প্রধান প্রতিবন্ধক ছিলেন প্রতাপশালী জমিদার, আর তার দোষর ইংরেজ সরকার। আরও পরিস্কার কথায় বলা যায়, এক দিকে জমিদারের হুকুম তামিলকারী বেতনভুক্ত—লেঠেল, আর অপর দিকে সরকারের বেতন ভুক্ত লেঠেল—পুলিশ বাহিনী। তাছাড়া সরকারী আইনও রয়েছে তাদেরই পক্ষে। পক্ষান্তরে কৃষকগণ শুধু অসংগঠিত ও অসহায়ই ছিলনা, তারা পরস্পর ছিল সনিন্ধমনা ও প্রতিহিংসা-পরায়ন। সেই অসংগঠিতদেরকে লাল এক ঝাণ্ডার তলে সমবেত করা চাট্টিখানি কথা নয়। পার্টির কতিপয় তাত্বিকও ঐ অবস্থায় কৃষকদেরকে ঐক্যবদ্ধ করানকে শুধু দুঃসাহসিকতাই বিবেচনা করেননি, সে মুহূর্তে জমিদারদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে বাঁধ-বন্ধি দেয়ার উদ্যোগকে চরম হটকারীতা বলেও বিবেচনা করেছেন। কিন্তু বিষ্ণুদা সে দুঃসাহসিকতাকে সাহসের সাথে মোকাবেলা করতে এবং অসহায় ও অসংগঠিত কৃষকদেরকে সংগঠিত করার জন্য রাতে বাড়ীতে বাড়ীতে বৈঠকী সভা করতে লাগলেন। তখন তিনি একই রাতে বিভিন্ন স্থানে দু'তিনটি সভাও করেছেন।

পরস্পর প্রতিহিংসাপরায়ন ও সঙ্কির্ণমনা কৃষকদের ঐ সব বৈঠকী সভায় তিনি যা বলতেন তার সারমর্ম হলো: "কৃষক ভাই সব, আপনারা নিজ হাতে চাষ করে যে ধান ফলান, সে ধানেই দেশবাসী, তথা বিশ্ববাসী বেঁচে থাকে। কিন্তু বিশ্ববাসীকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আপনারা যে ধান ফলান, বর্তমান শোষিত সমাজ ব্যবস্থার দরুন সে ধান ভোগ করা থেকে আপনারাই হন বঞ্চিত। আর তাই থাকেন অভুক্ত ও অনাহারী। পক্ষান্তরে জমিদারগণ নিজ হাতে চাষাবাদ করেননা বা ফসল ফলাননা; এমন কি জমির ধারে কাছেও যাননা। খাজনা আদায়ের নামে তারা আপনাদের উৎপীড়ন-নিপীড়ন এমনকি জমি থেকে উচ্ছেদ করে শহরের প্রাণ কেন্দ্রে মহা আরামে ও আয়াসে জীবন যাপন করেন। অনুরূপভাবে আপনারা যারা শরীরের রক্ত পানি করে পাট উৎপাদন করেন, তারা ঐ পাট বিক্রয় করেন পানির দামে। আর ফড়িয়া-মাড়ুয়া প্রভৃতি যারা নিজ হাতে পাঠ উৎপাদন করেন না, তারা সে পাট বিক্রয় করে এক এক জন লালে লাল হয়ে যান। আবার ফড়িয়া—মাড়ুয়া প্রভৃতির সে পাট হুগলী, ডাণ্ডি প্রভৃতির পাটকলগুলিতে গিয়ে যে সব দ্রব্য উৎপন্ন হয়—যেমন ব্যাগ, চট, তাবু, কার্পেট ইত্যাদি—তা দেশে ও বিদেশে বিক্রয় হয়ে প্রচুর দেশী ও বৈদেশীক মুদ্রা অর্জিত হয়—যা দিয়ে রাষ্ট্র শাসন ব্যয়ের বিরাট অংশ নির্বাহ হয়। অপর দিকে বেসরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন মিল মালিকগণ সে বাড়তি মুদ্রায় নূতন নূতন মিল স্থাপন করে বিশ্ব বাজার কব্জা করেন। কিন্তু ঐ সব হয় মিলে যে সব শ্রমিক হাড় ভাংগা পরিশ্রম করে ঐ সব পাটজাত দ্রব্য উৎপাদন করে, সে হতভাগারাও কৃষকদের মতই থাকে অভুক্ত ও অর্ধ ভুক্ত। আর তারই পাশাপাশি ঐ সব মিলের যারা মালিক তারা শ্রম পানির দামে ক্রয় করে একের পর এক মিল বাড়িয়েই চলছেন। লক্ষ্যণীয় যে মিলের উপর তলার আর একদল সাহেব-সুবা যারা আদতে মালিকও নন শ্রমিকও নন—যেমন ম্যানেজার, এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর, সুপারভাইজার

প্রভৃতি মালিকদের অতিরিক্ত উদর পূর্তির জন্য শ্রমিকদের নাম মাত্র পারিশ্রমিক দিয়ে, কখনও গায়ে হাত বুলিয়ে, কখনও রক্ত চক্ষু দেখিয়ে- আবার কখনওবা সোহাগ করে, ক্ষেত্রভেদে শ্রমিকের মজুরী ও কর্মঘন্টা না কমিয়ে অতিরিক্ত কাজ আদায় করেন। আবার কখনওবা বরখাস্ত করে শ্রমিকদের অতিরিক্ত রক্ত ঝরানোর কতইনা ফন্দি-ফিকির বের করেন। ঐ ফাও বা ফোফর দাদালী বা মাতব্বরী মালিক পক্ষের বিরাট স্বার্থে আসে বলে তাদেরকে প্রতিটি খেটে খাওয়া শ্রমিকের একশ' গুণেরও অধিক মাইনে দেয়া হয়—যদিও উৎপাদন কর্মকাণ্ডের সাথে তারা কোথাও প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত নন। এসবের মূল কারণ— যারা উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত, বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার শোষ- নের স্বার্থে তাদেরকে শাসন প্রক্রিয়া থেকে সম্পূর্ণ দূরে রেখেছে। আর যারা দৈহিক খাটেন না বা পরিশ্রমজীবী—সেই বইপড়া পণ্ডিত, ডক্টর, রায়বাহাদুর, খানবাহাদুর, উকিল, মোক্তার, সিপাহী—পর্য্যায়ক্রমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসেন। আর এসব কারণেই আপনারা হচ্ছেন শোষিত ও নির্যাতিত। অতএব বিদেশীকে তাড়িয়ে স্বদেশী বা স্বদেশীকে তাড়িয়ে এমনকি বাংগালীদেরকে ক্ষমতায় বসালেও শোষণের অবসান হবে না। কারণ বাংগালী শোষণ আর ইংরেজ—পাঞ্জাবী শোষণের মধ্যে বস্তুগত কোন প্রভেদ নেই। যতদিন পর্যন্ত যারা প্রকৃত উৎপাদন করে সে শ্রমিক—কৃষকগণ রাষ্ট্র ক্ষমতায় না আসবে, যতদিন পর্যন্ত শ্রমিক— কৃষকরাজ কায়েম না হবে, ততদিন পর্যন্ত শ্রমিক-কৃষকের মুক্তি আসবে না—শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার ফালতু কথা বলে রাজনৈতিক মঞ্চে যে যতই গলাবাজী করুক না কেন— পুঁজিবাদী সমাজে পুঁজির মালিকরা শ্রমিকদেরকে শোষণ করবেই। অবশ্য কৃষক মুক্তির সে প্রক্রিয়া দীর্ঘ ও মন্থর। তাই স্থানীয় কৃষকদের আশু কর্তব্য হচ্ছেঃ নদীতে বাঁধ দিয়ে জমিতে লোনা জল প্রবেশ বন্ধ করা। লোনা জল প্রবেশ বন্ধ হলেই জমিতে সোনা ফলবে। আর তাই আসুন আমরা সকলে একত্র হয়ে

শাখাবাকী-জেলেখালিতে (একই নদীর দুই সংযুক্ত ও সংশ্লিষ্ট ঘের) বাঁধ দেই। এ বাঁধ দিলে শাখাবাকীতে সাত হাজার, জেলেখালীতে ষোল হাজার—একুনে তেইশ হাজার বিঘা জমি আবাদের উপযোগী হবে।

উল্লেখ্য যে, উক্ত শাখাবাকী নদী যেমনি ছিল খরস্রোতা, তেমনি ছিল দীর্ঘ ৩০ ফুট গভীর। তদুপরি নদীর ঐ ভয়ংকর খরস্রোতের মতই বাঁধ বাঁধার প্রবল প্রতিবন্ধক ছিলেন ভয়ংকর প্রতাপশালী জমিদার। পূর্বে অনুরূপ কোন বৃহৎ কাজ করা দূরে থাক, ঐ অঞ্চলের কৃষককুল জমিদারের সামান্যতম বিরুদ্ধাচরণ করতেও সাহস পায়নি। পূর্বেই বলা হয়েছে যে কৃষকগণ ছিল শতধা বিভক্ত। বিষ্ণুদার উপরোক্ত আলোচনায় কৃষকগণ আশার আলো পেলেও জমিদারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাঁধ দিতে তখনও ভরসা পাচ্ছিলো না। একজনতো ভট্‌ করে বলেই বসলো, বাঁধ দেবোতো জমিদারের লাঠিয়াল আর সরকারের পুলিশ এসে মাথা ফাটাবে না? বিষ্ণুদা উত্তরে বললেন: আপনারা আপনাদের জমির খাজনা জমিদার তথা সরকারকে দিয়ে থাকেন। জমিদার তথা সরকারেরই দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে, নদীতে বাঁধ দিয়ে আপনাদের জমিতে লোনা আসা বন্ধ করে দেয়া। তাদের আরও কর্তব্য হচ্ছে জমিতে সেচ ও কৃষির যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা। জমিদার সে সব দায় দায়িত্ব পালন না করে নিপীড়নের মাধ্যমে খাজনা আদায় করে নবাবী হালে শহরে থাকেন। আর এদিকে লোনা জলের প্রকোপে পড়ে বছরের পর বছর ফসল হানীতে আপনারা ছেলে—পিলে নিয়ে অনাহার অর্ধাহারে পশুর জীবন যাপন করেছেন। অতএব আর দাঁড়ুয়ে থাকার সময় নেই। এতে অন্যায়েরও কিছু নেই। আপনাদের উদ্যোগেই আপনাদেরকে বাঁধ দিতে হবে। তাতে জমিদারের লাঠিয়াল বা সরকারের পুলিশ

যদি আপনাদের মাথা কাটাতে আসেই তবে সমস্ত ইউনিয়নের ★ সমুদয় লোক একত্রিত হয়ে দাঁড়ালে তারা লেজ গুটিয়ে পালাবার সুযোগও পাবে না।

কৃষকদের এতদিনের মজ্জাগত সন্দিগ্ধতার দরুন সভার প্রথম দিকে মৃদু গুঞ্জন ও বিরূপ মন্তব্য উঠলেও শেষ দিকে একই সাথে কয়েকজন পুনঃ পুনঃ বলে ওঠেন, "শাখাবাকী বাঁধ আমরা বাঁধবোই; কোন বাঁধাই মানবো না।"

অতঃপর সিদ্ধান্ত হয় যে, ১৯৪০ সালের ডিসেম্বর (অগ্রহায়ণ) মাসে ধান কাটা শেষ হলে তারা শাখাবাকী নদীতে বাঁধ দেবে।

বিষ্ণুদা সে সময় প্রচার করলেন—যারা বাঁধ বাঁধার কাজে যোগ দেবে কৃষক সমিতি তাদেরকে সে বাঁধের আওতাধীন উদ্ধার করা জমি বিনা মূল্যে বিলি করবে। আর যাদের জমি জমিদার খাস করে নিয়েছেন সে সব কৃষক বাঁধের কাজে শরীক হলে তারা তাদের জমিতো পাবেই তদুপরি অপরাপর খাস করা জমির অনুপস্থিত কৃষকদের জমিও তাদের মধ্যে বিলি করা হবে।

জমি বিলির উক্ত আগাম প্রচারে সমস্ত কৃষক বিশেষ করে শাখাবাকী ঘেরের সাত হাজার বিঘা জমির মধ্যকার খাস ও উচ্ছেদকৃত অসংখ্য কৃষক সে বাঁধ বাঁধার কাজে অগ্রণীর ভূমিকা নেয়।

এদিকে জমিদারের লাঠিয়ালরা, যারা এতদিন স্রেফ পেটের ধান্ধায় জমিদারের পক্ষ হয়ে কৃষকদের লাঠি পেটা করেছে তারাও

☆ সাত মাইল দীর্ঘ আর সাড়ে পাঁচ মাইল প্রস্থ শোভনা ইউ-নিয়নের গ্রামগুলি হচ্ছে: শোভনা, চিংড়া, ঝলমলিয়া, বালিখোলা, তেলীগাতী, জীয়লতলা, বাগআঁচড়া, বাদুরগাছা, শিবপুর, কদমতলা, পাতিবুনিয়া, কাকমারী, বারৈখালী, মাদারতলা ওপার মাদারতলা। আর চৌহদ্দি হলো পূর্ব ও উত্তরে ভদ্রা, পশ্চিমে তেলিগাতী নদী, আর দক্ষিণে আটালীয়া ও মাগুরখালী।

তখন দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভাবতে থাকে যে, কৃষক সমিতি যদি নোনা মুক্ত খাস জমি তাদেরকেও দেয়, তবে তারাইবা ফাও লাঠিপেটা করে কৃষকদের মাথা ফাটাতে যাবে কেন? বস্তুতঃ ঐ দ্বিধা-দ্বন্দ্বের দরুণই লাঠিয়ালরা এবার আর পূর্বের ন্যায় জমিদারদের পক্ষ হয়ে কৃষকদের বিরুদ্ধে লাফিয়ে পড়েনি। এদিকে জমিদারদের বিশ্বাসই হয়নি যে, আধমরা-শতধা বিভক্ত কৃষককুল একদিন ঐক্যবদ্ধ হয়ে শাখাবাকীর ন্যায় বিরাট একটি খরস্রোত নদীতে বাঁধ দিতে পারবে।

কৃষক সমিতির উপরোক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অগ্রহায়ণের এক অমাবস্যা রাতে বাঁধ বাঁধার উপযুক্ত দিন ধার্য হয়। একটানা ৩০ ঘণ্টা কাজ চলবে, চাপান দেয়া হবে মাত্র এক ঘণ্টায়। তার জন্য মিলে গেলো দু'হাজার কর্মী, আর সংগৃহীত হলো দু'শ হ্যাজাক। দিবালোকের ন্যায় আলোয় আলোকিত রাতে কৃষক সমবেত হয়েছে শাখাবাকীর নির্ধারিত স্থানে। কৃষক সমিতির লাল ঝাণ্ডায় সমুদয় এলাকা লালে লাল হয়ে ওঠে। বিষ্ণুদা সমিতির পক্ষ থেকে মাটির প্রথম চাকটি কেটে নদীতে ফেলেন। আর তাঁরই দেখাদেখি দু'হাজার কর্মী রাতভর অবিশ্রাম ভাবে মাটি ফেলে যাচ্ছে। পরদিন সকালেও ঐ একই উদ্যমে কাজ চলছে। কৃষকদের কেউ কেউ সন্দেহ করছিল যে, জমিদার নিশ্চয়ই তার লাঠিয়াল ও পুলিশ নিয়ে এক সময় তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বেই। কিন্তু অপরাহ্ণ বেলায়ও তাদের কারোরই টিকিটিও দেখা গেলো না।

বেলা তিনটার দিকে ছিল আধ ঘণ্টার বিরতি। সেটা ছিল খাবারের সময়। পার্শ্ববর্তী গ্রামের মিলিত উদ্যোগে দু'নৌকা ভর্তি ভাত আসছে। আর দু'গ্রাম থেকে আসছে দু'নৌকা তরকারী ও ডাল। অপর দু'গ্রাম থেকে আসছে হাজার হাজার কলাপাতা। খাওয়া দাওয়ার পর নতুন উদ্যমে, দ্বিগুণ উৎসাহে, পুনরায় বাঁধ বাঁধার কাজ চললো।

সারা দিন কাজ করার পর নিশুতি রাতে চাপান দেবার মোক্ষম মুহূর্ত

এসে গেল। সে মুহূর্তে বিষ্ণুদা এসে দাঁড়ালেন সবার সম্মুখে। কারণ সেটাই ছিল দারুণ সংকটময় মুহূর্ত। সে সময়ের একটু গাফিলতিতে পূর্বের সমুদয় কাজই বরবাদ হয়ে যেতে পারে। আর তাই সেই নিশুতি রাত থেকে সকাল দশটা অবধি একটানা কাজ করে বাঁধের কাজ সমাপ্ত করা হয়।

এতদিন যে কৃষক ছিল ভীরু-ভীতু, নৈরাশ্য আর অদৃষ্টবাদে বিশ্বাসী, তারাই আজ বাঁধ বেঁধে বিরাট এক আত্মবিশ্বাসে বলিয়ান হয়ে ওঠে। আর তাই কাজ সমাপ্তির পরপরই এক বিজয় উল্লাসে কাঁধে কোদাল ফেলে জমিদারের কাচারীর কাছ দিয়ে "লাঙ্গল যার জমি তার, কৃষক সমিতি—জিন্দাবাদ" ইত্যাদি ধ্বনি দিতে দিতে নিজ নিজ গ্রামে চলে যায়।

উল্লেখ্য যে; ঐ বাঁধ বাঁধার কাজে যে সব মহীয়সী মহিলা পুরুষদের বিপুল ভাবে সাহায্য করেছেন ও অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন তাদের নেতৃত্ব দিয়েছেন সনামধন্যা বিদ্যাধরীদি। আর তার সহযোগী ছিলেন অভয়চরণ জোয়ারদারের স্ত্রী—যমুনাদি, অভয়চরণ সরদার (মালের) স্ত্রী নিস্তারিনী, সুধান্য রায়ের স্ত্রী—তরংগ বালা, হাজরাগদর মা-বা ঠাকুরদাসের স্ত্রী—মালতী, সতীশ হালদারের স্ত্রী—প্রভাবতী, সতীশ হালদারের ভগ্নি—কিরণ বালা প্রমুখ (প্রয়োজন অনুযায়ী এদের কারো কারো বিশদ বিবরণ পরবর্তী অধ্যায়েও দেয়া যাবে)।

শাখাবাকী নদীতে বাঁধ বাঁধার পরেই বিষ্ণুদা উক্ত ঘেরের খাস-করা জমিদারের জমিগুলি সমিতির মাধ্যমে কৃষকদের বিলি করে দেন। এভাবে বিষ্ণুদার পূর্ব ঘোষিত ওয়াদাই শুধু পুরণ হয়নি, কৃষক সমিতির "লাংগল যার, জমি তার" ধ্বনিও কার্যকরি হলো। আর এমনি করেই এতদাঞ্চলে কৃষক—আন্দোলনে এক যুগান্তর আসে।

জমি দখল ও তার সুষ্ঠ বণ্টনের মধ্যদিয়ে বিষ্ণুদা কৃষকদেরকে করেছেন দৃঢ় ঐক্যবদ্ধ। আর তারই সাথে সাথে প্রতিপক্ষ জমিদারদের

করেছেন একদম কোনঠাসা। আর এ ভাবেই কৃষক সমিতির দ্বিতীয় জেলা সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয়েছে।

জেলেখালী বাঁধ আন্দোলন

শাখাবাকী বাঁধ দেয়া কালেই বাংলার অন্যতম বৃহৎ জেলেখালী বাঁধ দেয়ার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছিলো। কারণ সেটি ছিল শাখাবাকীরই সংযোগ খাল। জেলেখালীর এ বাঁধ দেয়া নাহলে পূর্বের দেয়া শাখাবাকী বাঁধের কোন মূল্যই থাকেনা।

উক্ত জেলেখালীর খালকে "খাল" বললেও আদতে কিন্তু সেটাও ছিল নদী। পূর্ববর্তী কয়েক বছর সে খাল খোলা থাকায় ভেংগে বেশ বড় নদীতে পরিণত হয়েছে। আর তা যেমন হয়েছে ওসার (চওড়া) তেমনি গভীর, তদুপরি তাতে ছিল গভীর স্রোত। সে বাঁধটি দিলে ঘেরের ষোল হাজার বিঘা জমি চাষোপযোগী হবে।

ঐ জেলেখালী খাল বা নদী সংশ্লিষ্ট গ্রামের কিছুটা ভিতরে ছিল কয়েক ঘর মৎসজীবীর বাস। তারা খাল-বিল-নদী-নালার মাছ ধরে সংসার নির্বাহ করতো। জমিদারগণ ঐ ক'ঘর মৎসজীবীকে কৃষকদের বিরুদ্ধে দাড় করাবার মোক্ষম হাতিয়ার হিসেবে বেছেনেন। জমিদারদের কারসাজি ও অর্থেই মৎসজীবীগণ খুলনা সদর মহাকুমা হাকিমের কোর্টে এক মামলা দায়ের করে। তাতে নিবেদন করে :-

শোভনা ও পার্শ্ববর্তী গ্রামসমুহের কয়েকজন হিন্দু-মুসলমান মাতব্বর ঐ ক'ঘর গরীব মৎসজীবীকে সেখান থেকে উচ্ছেদ করার ষড়-যন্ত্র করছেন। মৎসজীবীদেরকে মৎস শিকারের জন্য প্রতিদিনই জেলে

পাড়ার খাল বাহিয়া বাহিরের বড় নদীতে যেতে হয়। কিছু দিন পূর্বে উক্ত মাতব্বরগণ শাখাবাকী নদীতে বাঁধ দিয়েছে। এবার জেলেখালীতেও বাঁধ দিলে তাদের জাল ও জালের বড় বড় নৌকা সে বাঁধে আটকে পড়বে। ফলে এ গরীব প্রজাদের রুজি—রোজগারের সকল পথই বন্ধ হয়ে যাবে। তখন তাদের হয় অনাহারে মৃত্যু, নয়তো দেশ ত্যাগ ছাড়া গত্যান্তর থাকবেনা। অতএব, হুজুর, ধর্মাবতার, দয়াপরবশ হয়ে এ অনুগত প্রজাদের বাঁচার বিহিত ব্যবস্থা করার আজ্ঞা হয়।

মহাকুমা হাকিম সে মোতাবেক মৎসজীবীদের অভাব-অভিযোগ সরেজমিনে তদারক করার জন্য তড়িৎ গতিতে শোভনায় এলেন। জমিদারের পাইক-বরকন্দাজগণ মাথায় পাগড়ী বেঁধে পাড়ায় পাড়ায় শুনান দেয়: হাকিম আসছেন। সকলে যেন জমিদারের কাচারীতে হাজির হয়।

হিন্দু-মুসলিম সকল মাতব্বর একত্র বসে বললেন: হ্যাঁ, যেতে হবে সকলকেই। ছেলে-বুড়ো-মহিলা সবাই যাবে।

জেলেখালী বাঁধ না থাকায় নোনা পানি প্রবেশ করে বছরের পর বছর শস্যহানী ঘটিয়ে অসংখ্য কৃষককে যে নিঃস করেছ এ কথাটা হুজুরকে পরিস্কার করে বুঝাতে হবে। এ সোজা কথাটা হুজুর বুঝবেন না? সারা মহকুমার দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা, কঠিন কঠিন মামলার সুক্ষ বিচার করে রায় দেন, যে সে বুদ্ধিতো নয় তার! সরকারই কি যাকে তাকে হাকিম করে পাঠান? বিচারক হচ্ছেন ধর্মাবতার, মাথা ভর্তি কত বুদ্ধি! তিনি গো-মুর্খ নয়তো যে বুঝতে পারবেননা! —এসব ভেবে তারা আশ্বস্ত হলো যে, এবার হুজুরের কৃপায় তারা বাঁধ দিতে পারবেই। ★

সরকার ও সরকারী কর্মচারীদের প্রতি কৃষকদের এ এক অন্ধ

★ বিষ্ণু চট্টোপাধ্যায়ের "শোভনার বাঁধ" শীর্ষক নিবন্ধ: অমর কৃষক নেতা বিষ্ণু চট্টোপাধ্যায়।

বিশ্বাস। তাদের বিশ্বাস, অন্তরে অন্যায় ও পাপ থাকলে রাজ্য চালানো যায় না।

ভদ্রা নদীর পাড়ে জিয়লতলায় জমিদারের প্রকাণ্ড কাচারী বাড়ী। শোভনা ও তার পার্শ্ববর্তী চার-পাঁচ ইউনিয়নের হিন্দু-মুসলিম মাতব্বর ছাড়াও বহু সাধারণ কৃষকও উক্ত কাচারীতে উপস্থিত হয়েছে। মহিলা-গণও বাদ পড়েনি। এমন সময় দেখা গেলো, জমিদারের গ্রীণ বোটে চড়ে হাকিম সাহেব আসছেন। তার পরিধানে ছিল হাফ প্যান্ট ও সাদা সার্ট; আর মাথায় ছিল সোলার হ্যাট্। হাতে চামড়ায় বাঁধান ছোট একটি লাঠি নিয়ে তিনি গ্রীণবোট থেকে বেরিয়ে এলেন। তার পেছনে এলেন জমিদার।

দু'পার্শ্বের লোকজন সরে গিয়ে তাকে পথ করে দিচ্ছে। তারা কোমর বাঁকা করে সামনে ঝুকে পড়ে কেউবা আদাব, আর কেউবা নমস্কার দিচ্ছে। যারা ক্ষমতার উচ্চাসনে থাকেন, তারা এসব ইতর প্রাণীদের আদাব বা নমস্কারে সাড়া দেন না। ঐ আমলারা এক জাত। এ সব চাষাভুষার দলতো ছার, দেশের সাধারণ লোকের সাথেও এরা কথা বলতে ঘৃণা বোধ করেন- নমস্কারের প্রতি উত্তরেরতো প্রশ্নই ওঠে না!

হাকিম সাহেব কাচারীতে আসন নিয়ে আচমকা লাঠি ঠুকে মিলিটারী কায়দায় ধমকিয়ে (উল্লেখ্য যে, প্রথম মহাযুদ্ধের মিলিটারী ফেরৎ হাকিম সাহেব চলনে—বলনে তখনও মিলিটারী) বললেন, তোমরা কোন সাহসে গরীব মালোদের (জেলেদের) উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র করছো? তোমাদের মাতব্বর কে কে? তাদের নাম বল? তোমরা কি মনে করছ যে, দেশে অরাজকতা চলছে? দেশে কি গভর্ণমেন্ট নেই? সব ক'টাকে নিয়ে জেলে পুরবো, ভাবছ কি? এত বড় স্পর্ধা! বল, কি বলার আছে? কেন এ কাজ করছ?

হাকিমের এসব আগাম উক্তিতে উপস্থিত কৃষকগণ একদম 'থ'

মেরে যায়। ঐ আগাম শুনানীর পর তাদের যা বলার ছিল তা শুনলে হাকিমের সে আগাম সিদ্ধান্তের যে সামান্যতমও পরিবর্তন হবেনা তা তখন সকলের কাছে দিবালোকের ন্যায় স্বচ্ছ হয়ে গেলো। এদিকে হাকিম সাহেব কৃষকদের 'থ' মেরে যেতে দেখে আবার হুঙ্কার ছাড়লেন : কি বলার আছে বল? এখনতো ভিজে বিড়াল হয়ে আছ। অন্য সময় তোমরাই নাকি বাঘ হয়ে দাড়াও শুনি! আমি বাঘগুলির মুখ দেখতে চাই।

অতঃপর হুজুর ফাইল খুলে ফর্‌ ফর্‌ করে কয়েকটি পাতা উল্‌টে বললেন : এই যে—সতীশ হালদার, সমস্তি শেখ, সোবহান সরদার, রামহরি মণ্ডল, ধলু সরদার, ছদন মোল্লা, শশী ঢালী, নেপাল বসাক, কেরামতুল্লাহ, ক্ষেত্র বিশ্বাস, আফসার মোড়ল—তোমরা উঠে দাড়াও।

সতীশ হালদার, সমস্তি শেখ প্রমুখ তখন একে একে উঠে দাঁড়ান—প্রাণহীন এক একটি কাঠের মূর্তি যেন দাঁড়িয়ে আছে! এমন ঘটনা তাদের ছিল কল্পনার অতীত, স্বপ্নেরও অগোচর।

হুজুর আবার কামান গর্জালেন : তোমাদেরকে ঐ বাঁধ দিতে জমিদার পূর্বেই নিষেধ করেছেন। কোন সাহসে তা অমান্য করে এ কাজ করতে যাচ্ছ, সে কথা শুনতে চাই।

এবার সতীশ হালদার বললেন : জমিদারকে অমান্য করতে আমরা চাইনে। আমাদের এত জমি অথচ বাঁধের অভাবে তাতে ধানের একটি চিটেও হয় না। আমরা নাখেয়ে মরছি। গ্রামের পাঠশালাগুলি উঠে গেছে। নিজেই চেয়ে দেখুন—এ বলে উপস্থিত মহিলাদের দিকে আংগুলি তুলে বললেন—মেয়েদের কারুর পরনে একটিও আস্ত কাপড় নেই। ....এ পর্যায়ে দরাম করে হুজুরের লাঠির বাড়ি গড়লো সামনের টেবিলের পরে। "থাম, থাম, বেশ বক্তৃতা দিতে শিখেছ দেখছি! তা মালোদের সর্বনাশ না করে জেলে পাড়ায় খালটা বাদ

দিয়ে, বাঁধ দেয়া যায় না?"

হুজুরের উপরোক্ত মন্তব্যে বুঝা গেল যে, বাঁধ বাঁধার প্রয়োজনীয়তা হুজুরও অনুভব করছেন—শুধু সমস্যা দাঁড়িয়েছে, বাঁধের স্থান নির্বাচন নিয়ে।

সে সময় সমস্তি শেখ সতীশ হালদারের পার্শ্বেই দণ্ডায়মান ছিলেন। ছোট একটুখানি মানুষ—পাট খড়ির ন্যায় পাতলা। কয়েক গাছি পাকা পাকা দাড়ি। দেখলে মনে হবে, কবরের দিকে এক পা দিয়েই দাঁড়িয়ে আছেন। তার গলা থেকে আওয়াজ বেরুলো। এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত শত শত লোক বুঝলো,—এ সমস্তি শেখের আওয়াজ। সে আওয়াজে ছিল: হুজুর, মালোদের কোন ক্ষতি আমরা করবোনা। নদীর পাড়ে জাল-দড়ি, শুকানোর জন্য আমরা তাদেরকে লেখাপড়া করে জমি দেবো। নৌকা রাখারও জায়গা দেবো। বাঁধের মধ্যে যত মাছ পড়বে তা তারাই ধরে বিক্রয় করবে। তাদের মধ্যে যাদের ধানের জমি আছে, আমাদেরই মত তাদের জমিতেও ধান হবে। কিন্তু জেলে পাড়ায় বাঁধ না বাঁধলে—বাঁধ ভেংগে বরবাদ হয়ে যাবে। আমি বুড়ো মানুষ, আমার কথায় বিশ্বাস না হয় নিজের চোখেই দেখে আসুন......

একথায় হুজুর বাঁধ সম্পর্কে যেন একজন বিশেষজ্ঞ এমন ভাবে ধমক মেরে বললেন: আমার চোখে দেখতে হবেনা। এমনিতেই তোমাদের শয়তানী বুদ্ধি আমি বেশ বুঝতে পারছি। সব কটাকে বেঁধে চালান দেবো।

হাকিমের উপরোক্ত হুকুমের মুখে উঠে দাঁড়ালেন জনৈক মহিলা। বলিষ্ঠ—গৌরকায়া, ঋজুদেহ, পরিধানে সাদা কাপড়, মাথার চুল ছোট করে ছাটা-বিধবার বেশ। বয়স তিরিশ-বত্রিশের মত। তার চোখে যেন আগুন ঠিকরে পড়ছে! বললেন: তুমিতো সাহেব জমিদারের কাচারীর খাসি-মুরগী খেয়ে মালোদের পক্ষে রায় দিয়ে গেলে। তুমি

কি মনে কর, আমরা তোমার মতলব বুঝিনে? জমিদার আমাদের সমস্ত জমি খাস করে নিতে চায়, আমাদের না খাইয়ে মারতে চায় ....

..... এত কিছু শুনার ধৈর্য হুজুরের ছিলোনা। তাই মাঝখানে বাঁধা দিয়ে তিনি হুঙ্কার ছাড়লেন: কে? কে কথা বলছে?

সমান জোরে উত্তর এলো: আমি; নাম বিদ্যে। নমশুদ্রের মেয়ে। কলাতলায় বাড়ী। লেখে নেও তোমার কাগজে —এই বলে বিদ্যেধরীদি অপরাপর মেয়েদের দিকে তাকিয়ে বললেন:

"চল, চল সব। এখানে কোন বিচার নাই, ধম্মও নাই, দু'ডো ভাতের জন্যি সারাদেশ উজার হৈয়ে যাচ্ছে। ছেলে-পেলে না খাইয়ে মরতিছে, সে ভাতের জন্যি বান বানবো, তাও উনি চালান দেবেন! যাবো জেলে, নিয়ে চলো সকলরে বান্ধে। আপদ চুকে যাক।" অতঃপর—"এই, চল চল। ধা করে চল"—বলে তাড়া করে সকলকে নিয়ে চলে গেলেন।

শাখাবাকী বাঁধ দেবার পর কৃষকদের মধ্যে একতার যে জোয়ার এসেছিল, হুজুরের হুমকি ও ধমকিতে সে একতা শুধু বিনষ্টই হয়নি' পূর্বের স্বভাব ও মজ্জানুসারে পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস ও রেশারেশী পুনরায় মাথাচড়া দিয়ে ওঠে। ইত্যবসরে মহকুমা হাকিমের কোর্ট থেকে ইউনিয়নের মাতব্বরদের নোটিশ দিয়ে ডেকে এই বলে মুচুলকা লিখায়ে নেয় যে, তারা জেলেদের নিরাপত্তা বিধান করবে এবং জেলেখালী খালের মাছ জেলেরা ছাড়া আর কেউ ধরতে পারবেনা।

উক্ত মুচুলকা লেখাবার পরও জমিদারগণ আশ্বস্ত হতে না পেরে নিজেদের উদ্যোগ ও নিজেদের খরচায় মালোদের নামে ১৪৪ ধারা জারী করেন—যাতে কৃষকগণ আলোচ্য এলাকায় একত্রিত হতে না পারে। কারণ এবার তাদের ভয় যে, কৃষকগণ একত্রিত হতে পারলে পূর্বের শাখাবাকীর ন্যায় জেলে পাড়ায়ও বাঁধ দিয়ে দেবে।

মুচুলকা লেখা ও ১৪৪ ধারা জারীর পর জমিদারগণ এবার এক দানবীয় রূপ ধারণ করেন। এখন আর রাখা—ঢাকা নয়, কোন আবরণও নয়—একেবারে নগ্ন ও উলংগ। জমিদারের গুণ্ডা বাহিনী তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে কৃষকদের, আর কৃষকগণ পালিয়ে বেড়াচ্ছে বনে-জঙলে।

ঐ অসহনীয় অত্যাচারের মুখেও অসংগঠিত কৃষকগণ কিয়ৎকালের মধ্যেই বিষ্ণুদার নের্তৃত্বে পুনরায় সংগঠিত হয়ে ওঠে। শোভনা অঞ্চলের বাঁধের সমস্যা যে কৃষকদের বাঁচা-মরার সমস্যা, এ সত্যটা তারা ইতিমধ্যেই হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছে। আরও উপলব্ধি করেছে যে, শাখাবাকীর সংযোগ সাধনকারী জেলেখালী বাঁধটি না দিতে পারলে শাখাবাকী বাঁধ দেয়ার কোন মূল্যই হবেনা। আর তাই সে সব কথা উল্লেখ করে তারা জমিদার ও সরকারের কাছে গণ-দরখাস্ত করে এবং ডেপুটেশন দেয়। কিন্তু কসাই যেমন গো-হত্যা নিবারনী আন্দোলনে শরীক হতে পারেনা, তেমনি কৃষক উচ্ছেদ করে যে জমিদারগণ জমি খাস করার কুমতলবে আছেন, তারাও সে গণ-দরখাস্ত বা ডেপুটেশনে ভুলতে পারেন না।

অবশ্য কৃষক সমিতি ও তার নেতা বিষ্ণুদা' জমিদার বা সরকারের কৃপার আশায়ও বসে নেই। তারা নূতন উদ্যমে বৈঠকী আলাপ চালাতে লাগলেন। চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছার উদ্দেশ্যে কৃষক সমিতির এক বর্ধিত সভা ডাকা হয়। সে সভায় বিপুল সংখ্যক সদস্যের উপস্থিতি ঘটে।

উক্ত সভায় সতীশ হালদার বললেন: বাঁধ আমরা বাঁধবোই! তাতে যে বাধাই আসে আসুক—আমরা পরোয়া করিনে।

সমস্তি শেখ গর্‌জে ওঠেন; কবরে এক পা দিয়ে দাঁড়ায়েই আছি। তা এভাবে না খেয়ে জানোয়ারের মত মরতে আমি রাজী নই। মরতে হয়তো বাঁধ বেঁধেই মরবো।

নেপাল বসাক বললেন : নিজেরা না খেয়ে শুকিয়ে মরার পথে গেছি। ছেলে-মেয়েগুলি যাতে এ আজাব না পায় তার ব্যবস্থা আমাদের করতেই হবে। বাঁধ আমাদের দিতেই হবে।

কাশেম শেখ বললেন : ঠিকই বলছ বসাক ভাই। এত জমি থাকতে বাল-বাচ্চাগুলোর মুখে আজ এক মুঠো ভাত দিতে পারছিনা। অথচ খোদা আমাদের কাছেই তাদের পাঠায়েছেন। ......তাদের জান বাঁচানোর জন্য যদি জেলে পচে মরতে হয়, এমনকি গুলী খেয়েও মরতে হয় তাতেও পিছপা হবোনা।

রামহরি মণ্ডল বললেন : ক্ষিধে আর লাঠি পেটাতো অনেক সহ্য করেছি। বাচ্চা-কাচ্ছাগুলিকে আর তা ভোগ করাতে চাইনা। তারা যেন কোনদিন না মনে করে যে, তাদের বাবা-কাকারা বাঁধা বলদের মত শুধু পড়ে পড়েই মরছে, একবারও মাথা তুলে দাঁড়ায়নি। ☆

অতঃপর সভায় সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলো : জেলেখালীর বাঁধ বাঁধতে হবেই।

মালোদের (জেলেদের) মধ্যে যাদের ধানের জমি আছে তাদেরকেও বাস্তব অবস্থাটা পরিস্কার ভাবে বুঝিয়ে ইতিমধ্যেই বাঁধ বাঁধার পক্ষে আনা হয়েছে।

অতঃপর ১৯৪১ সালের জানুয়ারী (পৌষ) মাসের এক গভীর রাতে কৃষক সমিতি ও বাঁধ কমিটির সভা হয়। সে সভায় অভিজ্ঞজন মত দিলেন যে, ঐ বাঁধ বাঁধতে একমাস সময় লাগবে। কিন্তু জমিদার ও তাদের সহায়ক—সরকার এবং জমিদার পক্ষের মুষ্ঠিমেয় মালো টের পেলে ১৪৪ ধারা জারীর জায়গায় বাঁধ দিতেতো দিবেইনা বরং এক তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে বসবে। তাই সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, ঐ বাঁধ বাঁধার এক মাসের কাজটা এক রাতেই সমাপ্ত করতে

☆ বিষ্ণু চট্টোপাধ্যায়ের "শোভনার বাঁধ" শীর্ষক নিবন্ধ : অমর কৃষক নেতা বিষ্ণু চট্টোপাধ্যায়।

হবে। ভলন্টিয়ারগণ সমস্ত এলাকা জুড়ে এমন ভাবে পাহারা দেবে, যাতে জমিদারের লোক বা মালোরা সে রাতে থানায় গিয়ে খবর দেয়ার সুযোগটিও না পায়।

নির্ধারিত রাতে বাঁশের মাথায় প্রচুর হ্যাজাক ও ডেলাইট জ্বালিয়ে দেয়া হলো। দিলোকের ন্যায় আলোকিত রাত-দ্বিপ্রহরেই বাঁধ বাঁধা সমাপ্ত হয়। কিন্তু হায়! ঠিক সে মুহূর্তে বাঁধের ঠিক মাঝ-খান দিয়ে ভেংগে প্রবল বেগে জল প্রবাহিত হতে থাকে। ঐ প্রবাহিত জলের সে কি ক্রুদ্ধ গর্জন। জলস্রোতের প্রচণ্ড আঘাতে দু'পাড়ের জমি ভেংগে পড়ছে। আর বাঁধে পোতা ডাল-পালা-খুটি দুমড়ে, মুচড়ে, ভেংগে চুরমার করে দিচ্ছে।

বাঁধের সে অবস্থা দেখে সবাই তখন হতাশ হয়ে পড়ে। সে হতাশ মুহূর্তে লাইটের বাত্তিগুলিও তেলের অভাবে নিভে যাচ্ছে। এমনি অবস্থায় কৃষক সমিতির সমস্ত শক্তি সমাবেশের উদ্দেশ্যে নগেন মল্লিক, নগেন সরকার, হাজের, মোত্তালেব, হাজারী, বাদল, অজিত, সুধান্য প্রভৃতি কর্মী পার্শ্ববর্তী ইউনিয়নগুলিতে গিয়ে খবর দেন। আর সে খবর পাওয়া মাত্র খরনিয়া, আটলিয়া, ডুমুরিয়া, সাহস, ভাণ্ডার-পাড়া প্রভৃতি চতুর্দিকের ইউনিয়ন থেকে হাজার হাজার কৃষক ছুটে আসে। সে ছুটে আসার সময়ে চলার পথে তাদের ধ্বনি ছিল: ল'ংগল যার, জমি তার। জেলেখালীর বাঁধ আমরা দেবোই। কৃষক সমিতি কি-জয়" ইত্যাদি, ইত্যাদি।

ইত্যবসরে অভয়চরন জোয়াদ্দার তার সেজো সন্তান সুধান্য বাবুকে একান্তে ডেকে বলে, "বাঁধ ভেংগে গেলোতো তুই বেঁচে রইলি কেন?"—এ শুনে সুধান্য বাবু তখন মরণপণ করে মা যমুনাদির পা ছুঁয়ে বিদায় নেন। অতঃপর তিনি বিষ্ণুদার কাছ থেকে পঁচিশ জন দক্ষ কর্মী নিয়ে ভাংগা বাঁধের মাঝ বরাবর স্থানে একের পর এক করে পঁচিশটি নৌকা ডুবিয়ে দেন।

এদিকে স্থানীয় কর্মীগণ নূতন আগন্তুকদের নিয়ে নূতন উদ্যমে দ্বিগুণ উৎসাহে পূর্বোক্ত ডোবা নৌকার উপর মাটি ফেলে ভোর হওয়ার সাথে সাথেই বাঁধ বাঁধা সমাপ্ত করে। তবে বাঁধের দু'দিক আরও মজবুত করার জন্য দুপুর পর্যন্ত কাজ চলে।

দুপুর দু'টার দিকে এস, ডি, ও মি: আধিক্রম মজুমদার এসে দেখেন যে, বহুপূর্বেই বাঁধ বাঁধা সমাপ্ত হয়েছে। তিনি আরও দেখলেন যে, হাজার হাজার কৃষক যে কোন বাঁধা প্রতিহতের উদ্দেশ্যে বাঁধের উপর শুয়ে অপেক্ষা করছে। দণ্ড মুণ্ডের অধিকর্তা এস. ডি, ও সাহেব তখন আর কি করবেন? অগত্যা তিনি পাঁচ মিনিট কার্য বিরতির অনুরোধ করেন। তার সম্মানার্থে ঐ পাঁচ মিনিটের স্থলে তিন মিনিট কার্যবিরতি রাখা হয়—যদিও পূর্বেই বলা হয়েছে যে, প্রকৃত পক্ষে তার বহু পূর্বেই বাঁধের কাজ সমাপ্ত হয়েছে!

উপরোক্ত ঘটনা দৃষ্টে প্রশ্ন জাগে—হায়রে আইন! হায় তার প্রয়োগ! বুর্জোয়া শাসক তাদের শাসন-শোষণ অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে যে আইন প্রনয়ন করেন, তাদেরই দোসর ক্ষমতার অধিষ্ঠিত নন এমন অপর বুর্জোয়ারা নিজেদের স্বার্থে সে আইনকে যে কিভাবে ব্যবহার করেন, ইহা তারই একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ১৬০০ বিঘা ঘেরের হাজার হাজার প্রজার খাজনা পান জমিদার। প্রজাহিতার্থে খাজনা আদায়-কারী জমিদারই ঐ বাঁধ বাঁধতে ন্যায়তঃ বাধ্য। তিনি তাতো বাঁধেনই নাই, বরং এ বাঁধ যাতে না বাঁধা হয় তার জন্য শান্তি ভংগের থোড়া অযুহাত দেখিয়ে ১৪৪ ধারা জারী করেই প্রকৃত পক্ষে অশান্তির বীজ বুনলেন। আর তারই ফলশ্রুতিতে জমিদার প্রতিভু কুখ্যাত তদানিন্তন সরকার শুধু ১৪৪ ধারা জারী করেই ক্ষ্যান্ত হননি, সে বাঁধ যাতে না হয় তারই অতন্ত্র প্রহরী স্বরূপ এসে গেলেন তারই প্রতিনিধি এস, ডি, ও বাহাদুর। যুগ যুগ ধরে বঞ্চিত-লাঞ্ছিত-অবহেলিতদেরকে অনুরূপ মিথ্যা আইনের যাতাকলে ফেলে অধিকার থেকে বঞ্চিত করা

হচ্ছে। আজও তার ব্যত্যয় ঘটেনি।

এখানে আরও লক্ষণীয় যে, যারা জমিকে সন্তানের ন্যায় জানেন তারা জমির মালিক নন, আর যাদের পা'ই মাটিতে পড়েনা তারাই সে মাটির মালিক। হায়! এ অন্যায় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী কবি কি অনুগম ছন্দইনা গেথেছেন :-

জনগণে যারা জোঁক সম শোষে
তারে মহাজন কয়,
সন্তান সম পালে যারা জমি
তারা জমিদার নয়।
মাটিতে যাদের ঠেকেনা চরণ,
মাটির মালিক তারাই হন!
যে যত ভণ্ড ধরিবাজ আজ সেই তত বলবান,
নিতিনব ছোরা গড়িয়া কশাই বলে জ্ঞান-বিজ্ঞান।
ভগবান! ভগবান!

উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত বাঁধ দু'টি দেয়ার পর থেকে মাঠে ফসলের শুধু প্রাচুর্যই ঘটেনি, আউশ ও আমন এ দু'টি ফসলও ফলতে আরম্ভ করেছে।

আন্দোলন : গ্রাম থেকে শহরে

আলোচ্য সময় অর্থাৎ চল্লিশ দশকের প্রথম দিকে বিষ্ণুদার ছিল তিন স্তরের কর্মধারা। যথা—বাঁধ দেয়া, বাঁধের ভিতরকার খাস জমি দখল ও সে দখলকৃত জমি কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করা। আর বণ্টনকৃত জমিতে ফসল করা ও সে ফসল কৃষকদের খামারে

তোলা নিশ্চিত করা। সে অবস্থায় জমিদারগণ এমন কোণঠাসা হয়ে পড়েন যে, নিজেদের খাসের জমির ধানও রাতের আঁধারে লাঠিয়াল দিয়ে কেটে নিতে হতো।

১৯৪৩ সালে পূর্বোল্লিখিত খাস জমির ধান অনুরূপ এক রাতের আঁধারে কাটার জন্য জমিদার লাঠিয়াল সরদার—পূর্বের ফরিদপুর, আর হালের ধানিবুনিয়া নিবাসী—কালীচরণকে নিযুক্ত করেন। সে আবদ্ধ কাজ যাতে শুভে-লাভে করা যায়, কালীচরণ সে আশায় পূর্বের অভ্যাস মত তুলসী তলায় দুধ ঢেলে যখন মায়ের কাছে আশীর্বাদ চাবে, ঠিক তৎমূহূর্তে পার্শ্বে দণ্ডায়মান দেখতে পান বিষ্ণুদাকে। বিষ্ণুদা তাকে নিজ পরিচয় দিয়ে জমিদারের ঐ ধান চুরিতে সাহায্য না করার আবেদন করেন এবং বলেন যে, সে যদি সমিতির পক্ষে থাকে তবে সমিতি তাকে জমি দেবে। সে তৎক্ষনাত বিষ্ণুদার কাছে প্রতিজ্ঞা করে যে, সে আর কোনদিন কৃষকদের বিরুদ্ধে লাঠি ধরবেনা। সেই থেকে লাঠিয়াল কালীচরণ জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সে প্রতিজ্ঞা পালন করেগেছেন। এ থেকে একটি বাস্তব সত্যই বেরিয়ে আসে যে, বিষ্ণুদা যে কোন দুর্যোগময় মূহূর্তে কি অকুতোভয়ে প্রতিদন্দ্বি জমিদার-শিখণ্ডীদের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে তাদেরকে আপন দলে টেনে নিয়েছেন।

শাখারাকী ও জেলেখালীতে পর পর দু'টি বাঁধ দিতে গিয়ে কৃষক-দের যে ঐক্য গড়ে উঠেছে তা দেখে জমিদারগণ খাস জমি দখলের নামে পূর্বের দৈহিক নির্যাতনের পথ পরিহার করে পুনরায় কৃষকদেরকে মামলা মকদ্দমা করে হয়রানী করতে আরম্ভ করেন। সে মামলা মকদ্দমায় অতিষ্ঠ হয়ে ১৯৪২ সালের মার্চ মাসে প্রখ্যাত কৃষক নেতা শচিন ঘোষ (খোকাদা) ও বিষ্ণুদার নেতৃত্বে ২/৪ হাজার কৃষক ছেলে-মেয়ে, জোয়ান, বুড়ো-বুড়ি মিলে ১২/১৪ মাইল পায়ে হেটে দৌলতপুর হয়ে ★

☆ ডুমুরিয়া থেকে কৈয়া হয়ে খুলনা আসার রাস্তা হয়েছে ১৯৫৮/৫৯ সালে।

খুলনা শহরে এসে জমায়েত হয়। সম্ভবতঃ সেটাই ছিল শহরাভিমুখী প্রথম প্রতিবাদ মিছিল।

উক্ত মিছিল প্রথম এসে উপস্থিত হয় ধর্মসভা রোডস্থিত কমিউনিষ্ট পার্টি ও কৃষক সমিতির অফিসের সম্মুখে। সেখান থেকে সে মিছিল যায় জমিদার শৈলেন ঘোষের বাড়ীর সম্মুখে।

উল্লেখ্য যে, জমিদারের অন্যায় খাস দখলের বিরুদ্ধে সেদিন কৃষক সমিতির মামলার শুনানির দিন ছিল। সে উপলক্ষেই কৃষকদের আগমন ও বিক্ষোভ প্রদর্শণ।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯৪৩ সালে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পট ভূমিতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বার্থেই অধিক ফসল উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সে অবস্থায় কৃষকই যখন স্বীয় উদ্যোগে বাঁধ বাঁধছে ও ফসল ফলাচ্ছে, তখন সে পরিপ্রেক্ষিতে জমিদারের অন্যায় ভাবে খাস করা জমিও ন্যায়তঃ কৃষকদের ফিরে দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। তদুপরি উৎপাদন প্রক্রিয়ায়ও জমিদারের কোন ভূমিকা নেই। এসব কারণে কৃষকদের ঐ গণতান্ত্রিক দাবীর প্রতি মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী তথা আপামর জনসাধারণের সমর্থন দিন দিন বেড়েই চলছিলো। আর সে সব কারণেই ১৯৪৪ সনের প্রথম দিকে সরকার ও জমিদার নতি স্বীকার করে এবং কৃষকদের দাবী অনুযায়ী সমিতির কথা মত জমি বিলি—বন্দোবস্ত করে দেয়। আর তারই সাথে সাথে সমিতির পক্ষ থেকে রুজুকৃত মামলাও সমিতি প্রত্যাহার করে নেয়।

উপরোক্ত ঘটনায় প্রেরণা পেয়ে ১৯৪৩|৪৪ সালে মাইটভাঙ্গার ছয় সাত শ' বিঘা খাস জমির উচ্ছেদকৃত কৃষক, সমিতির সহায়তায় জমি খাসের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে। সাতক্ষীরার জমিদার অতুল বৈদ্য খাজনার দায়ে ঐ সব জমি খাস করে বাঁশ গেড়ে দখল করে নিয়েছিলেন। প্রায় আড়াই বছর সে মামলা জজ কোর্টে চলার পর ১৯৪৬ সালের ফাল্গুন মাসে মামলার অপর একটি দিন পড়ে। সে দিন বাবু হিমাংশু চক্রবর্তীর নেতৃত্বে এবং রামলাল বিশ্বাস, বিষ্ণু বৈরাগী ও

বংশী ঘোষাল (কৃষক) প্রভৃতির সহায়তায় তিন—চার শ' কৃষক মাইট-ভাঙ্গা থেকে মিছিল করে খুলনা এসে জজ কোর্টের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। মহামান্য জজ তৎক্ষণাৎ অতুল বৈদ্যকে ডেকে ভিটে—বাটী উচ্ছেদকৃত কৃষকদেরকে পুনরবহালের আদেশ দেন। যারা কিস্তি-বন্দিতে খাজনা পরিশোধ করবে তিনি তাদের জমিও ফেরৎ দেবার শর্তে কৃষক সমিতির সাথে আপোষ করার নির্দেশ দেন।

উক্ত আদেশ বলে যারা গৃহহারা হয়ে শোভনা, খানিবুনিয়া, ছ'ঘরিয়া, বটিয়াঘাটা ও অন্যত্র গিয়েছিল তারাও তাদের জমি পুনরদখল পেয়েছে। যারা বকেয়া খাজনা পরিশোধ করেছে তারাও জমি ফেরৎ পেয়েছে। আর যারা কিস্তি বন্দিতে তখনও খাজনা পরিশোধ করতে পারেনি তাদের কারো কারোর মামলা এখনও খুলনা কোর্টে শুনানী হচ্ছে।

এদিকে ১৯৪৪ সালে দাকোপেও জমিদারের খাসের বিরুদ্ধে বাবু কুমার মিত্র, বাবু কালিপদ প্রমুখের নেতৃত্বে প্রায় পনের হাজার কৃষক শত শত ছিপ নৌকায় চড়ে খুলনা এসে সারকিট্ হাউজ ময়দানে জমায়েত হয়। শত শত ছিপ নৌকার সমুদয় কৃষক সারি বেঁধে খুলনায় এসে এক নয়নাভিরাম দৃশ্যের অবতারণা করে। কৃষকরা সারকিট হাউজ ময়দান থেকে সাব জজ কোর্টের সমুখে গিয়ে ডিমণ্‌ষ্টেশণ্‌ দেয়। ফলে এর ফলটাও ফলেছে পূর্বানুরূপই।

চল্লিশ ও পঞ্চাশ দশকের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

১৯৪৩ সালে দেশজুড়ে এক ঘোরতর দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সে দুর্ভিক্ষাবস্থায় খাজনা প্রদানকারী কৃষক প্রজা- সাধারণ জমিদার বা সরকারের কাছ থেকে কোন সাহায্যই পায়নি। তখন চলছিলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

উল্লেখ্য যে, প্রথম মহাযুদ্ধের ন্যায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ও ইংরেজগণ এদেশীয়দেরকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, যুদ্ধোত্তর কালে তারা ভারতীয়দেরকে স্বাধীকার দেবেন। দ্বিতীয় বারের আশ্বাসেও আশ্বস্ত হয়ে বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়াশীল চক্র পরবর্তীতে ক্ষমতায় যাবার পাঁয়তারা করে। আর তাই উক্ত দুর্ভিক্ষে জনসাধারণ মরলো কি বাঁচলো তাতে তাদের কিছুই আসলো গেলো না। বস্তুতঃ সে দুর্ভিক্ষে তাদের কুলের কারোরই অকাল মৃত্যু হয়নি বা হবার কোন কারণও ঘটেনি।

মহামারীতে গরু-ছাগল যেমন মরে একাকার হয়, সে আকালে চাষা-ভুষারাও ঐ জানোয়ারদের মতই মরেছে। বাঁচার তাগিদে অসংখ্য চাষা-ভুষার স্ত্রী-কন্যা একমুটি ভাতের জন্য পূর্বোক্ত প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের সন্তান সন্ততীদের কাছে তাদের একমাত্র সম্বল-ইজ্জতটুকুও বিক্রয় করেছে। এ কারণেই সে দুর্ভিক্ষ আর তার থেকে মুক্তি, আর ঐ যে যুদ্ধ আর তার থেকে পরিত্রাণের লক্ষ্যে তদানীন্তন ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের বিশদ পর্যালোচনা প্রয়োজন।

সে আকাল হয়েছিলো বাংলা ১৩৫০ সালে। তাই তাকে বলা হয় পঞ্চাশের মন্বন্তর। সে আকালে বাংলার বুকে ষাট লাখ লোক মারা যায়। তাছাড়া আকালে অখাদ্য-কুখাদ্য খাওয়ার দরুণও পরবর্তীতে কলেরা, উদরাময় প্রভৃতি মহামারীতে প্রাণ দিয়েছে আরও বিশ লাখ লোক।

সে ঘোর দুর্দিনে কংগ্রেস ও মুসলিমলীগাররা সস্তা বক্তৃতা-বিবৃতি দিয়ে নিজ নিজ দায়-দায়িত্ব এড়িয়েছেন। সে সময় লংগরখানা খোলার কথা বলে পরবর্তীতে যারা দানবীর, মানবীর,মহাপ্রাণ, মহানুভব হওয়ার প্রয়াশ নিয়েছেন তাদের মধ্যে সরকারী সাহায্য ছাড়া পৈত্রিক বাস্তু-ভিটে বিক্রয় করে নিজ উদ্যোগে লংগরখানা খুলেছেন এমন মহান নেতা নেহাতই কম মিলবে।

স্মর্তব্য যে, ১৯৪২ সালে নেতাজী সুভাস বসু-তথা আজাদ হিন্দ ফৌজ (আই, এন, এ)— এর সহায়তায় জাপানীরা বাহির দিক থেকে যখন আসামের কোহিমার আর বাংলার আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ দখল করে প্রকাশ্য দিবালোকে খোদ কোলকাতার বুকে পুনঃ পুনঃ বোমা ফেলছিলো, ফরোয়ার্ড ব্লক তখন আভ্যন্তরীণ ভাবে ইংরেজ সরকারকে নানান ভাবে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। ঐতিহাসিকগণই অবশ্য বলবেন যে সে সময় ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীকে তাড়াবার জন্য জাপান সাম্রাজ্যবাদীকে এদেশের বুকে ডেকে আনাটা নেতাজীর ঠিক হয়েছিল কিনা। তবে এটা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, সে সময় হবু ক্ষমতাকাঙ্খী দলগুলি যদি ইংরেজদের মদদ না জুগিয়ে অন্ততঃ নিষ্ক্রয়ও থাকতো, তবে সাময়িক হলেও হয়তো সে সময় ভারত বৃটিশ আধিপত্য হতে মুক্ত হতো। আর স্বাধীনতার নাম করে ইংরেজ পরবর্তী কালে ইংরেজদেরই সৃষ্ট কংগ্রেস ও মুসলিমলীগ (ঐ দু'টি পার্টিকে ইংরেজগণ কি ভাবে নিজের উদ্যোগে সৃষ্টি করেছেন তার বিশদ বিবরণ দেয়া হয়েছে—ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং খুলনা শহরের ইতিকথা গ্রন্থে)— এর হাতে যে ক্ষমতার হাত বদল করেছেন, তা তারা করতে পারতেন না।

নির্মম পরিতাপ ও পরিহাসের বিষয় যে, ঐ চরম মুহূর্তে তারা (সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টিগুলির নেতারা) সাম্রাজ্যবাদকে নির্মূল করার জন্য আঘাত না হেনে, উল্টে সাম্রাজ্যবাদকেই সাহায্য করলো। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের আশল উদ্দেশ্য যে এক চেটিয়া গোষ্ঠিগুলির বাজার দখলের সংগ্রাম একথা শ্রমিকদের না বুঝিয়ে শ্রমিকদের তারা বুঝিয়েছেন যে, এ যুদ্ধ হলো মাতৃভূমি রক্ষার সংগ্রাম। একচেটিয়া পুঁজির নাগপাশকে ছিড়ে ফেলার জন্য শ্রমিকদের সঙ্গবদ্ধ করা ও গৃহযুদ্ধের আয়োজন করা যেখানে দরকার ছিল, সেখানে তারা মাতৃভূমি রক্ষার নামে নিজের দেশের একচেটিয়া পুঁজিবাদকে শক্তিশালী হতে

সাহায্য করলো। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যাই হয়েছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও তাই হয়েছে। আমেরিকার শ্রমিক আন্দোলন ও নেতারা এমন প্রতিক্রিয়াশীল পথে চলে গিয়েছে যে শ্রমিকরা এখন তাদের অর্থ নৈতিক সুখ-সুবিধে ছাড়া কিছুই বোঝে না। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে, কম্বোডিয়া যুদ্ধের বিরুদ্ধে, আমেরিকার ছাত্রদের- বুদ্ধিজীবীদের প্রতিবাদ সোচ্চার হয়ে উঠেছে কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীর কোন প্রতিবাদ নেই। উল্টে নিউইয়র্কে কিছু দিন আগে বাড়ি তৈরী করার শ্রমিকরা প্রতিক্রিয়াশীলদের উস্কানিতে প্রতিবাদরত ছাত্রদের ওপরেই আক্রমণ করেছিল। অতি ধনী মালিকদের ছুড়ে-দেয়া রুটির টুকরোগুলি ওদেশে শ্রমিক আন্দোলনকে এ ভাবে সাম্রাজ্যবাদের সহায়ক শক্তি করে তুলেছে।

কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় লেনিন ও বলশেভিক পার্টির ডাক ছিল অন্য সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে পরিবর্তিত করো। রুশ দেশে তা করা হয়েছিল এবং শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে প্রথম বিপ্লব সেখানে সফল হয়। ✶ কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালেও আমাদের পার্টি তা করতে পারেনি।

স্মরণ করান যেতে পারে যে, প্রথম মহাযুদ্ধ কালে ইংরেজ ও তার মিত্ররা ঘোষণা করেছিলেন যে, দুর্বল জাতিসমুহের ন্যায্য দাবী ও অস্তিত্ব রক্ষাই তাদের অস্ত্র ধারণের অন্যতম কারণ। সমস্ত নিপীড়িত জাতি স্বাধীন হবে ঐ ঘোষণায় তখন সকলের মন গভীর ভাবে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। ★ ★ কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা ছিল তাদের প্রতারণা মাত্র।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালেও ঐ ইংরেজগণ অনুরূপভাবে এদেশীয়দেরকে যুদ্ধ উত্তর কালে স্বাধিকার দেবার আশ্বাস দিলে বুর্জোয়াচক্র পরবর্তীতে ক্ষমতায় যাবার পাঁয়তারা করেন। অবশ্য ইংরেজদের ঐ ঘোষণার

✶ রঞ্জন চৌধুরী : মার্কসীয় অর্থ নীতি।

★ শ্রী প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্র জীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য (৩য় খণ্ড)

পাশাপাশি হিটলারও ঘোষণা করেছিলেন : মানব সমাজের জীবজন্তু ভক্ষণের যেমন অধিকার আছে, সমস্ত এরিয়ানদেরও তেমনি অধিকার আছে সমগ্র মানব জাতীর উপর শাসন করার। ☆

এখানে আরও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯৪১ সালের ২১শে এপ্রিল জার্মান কর্তৃক লেনিনগ্রাড আক্রান্ত হলে মিঃ পি, সি, যোসীর নেতৃত্বে কমিউনিষ্ট পার্টি যখন সিদ্ধান্ত নেয়—'এ যুদ্ধ জন যুদ্ধ। আমাদেরকে ইংরেজদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করা কর্তব্য'—তখন এতদিনের ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে উত্তেজিত জনগণকে হঠাৎ করে সে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পার্টির পক্ষে আনা সম্ভব হয়নি। বস্তুত : এ পার্টিই ঐ যুদ্ধের প্রারম্ভে যথার্থ ভাবেই ঘোষণা করেছিল—'এ যুদ্ধ দুই সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠি-দুনিয়াটাকে ভাগ করে ভোগ করার যুদ্ধ। এতে আমরা নাদেবো একটি ভাই, না দেবো একটি পাই'। আর এমনি করেই পার্টি তখন জনগণ থেকে সম্পূর্ণ ভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

স্মর্তব্য যে, লেনিনগ্রড থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে বসে ঐ যুদ্ধকে জন যুদ্ধ বলে গলা ফাটানোতে যেমনি লেনিনগ্রাড ও ষ্ট্যালিনগ্রাডের উপর জার্মান আক্রমণের তীব্রতা লেশ মাত্রও কমেনি, তেমনি তাদের সে যুদ্ধকে জন-যুদ্ধ না বললেও যুদ্ধের প্রকটতা যতটা ছিল তার অধিক হওয়ারও কোন অবকাশ ছিলনা।

এখানে বিশেষ ভাবে স্মরণ করা যেতে পারে যে, সে সময় কোও-মিংটাং (কামউনিষ্ট ইন্টার ন্যাশনাল) প্রধান বুলগেরিয়ার জর্জ ডিমি-টভ ঘোষণা করেছিলেন যে, "প্রতিটি দেশের পার্টি যেন তাদের অবস্থা (ষ্ট্যাটিজি) অনুসারে যুদ্ধের ব্যাপারে নিজ নিজ সিদ্ধান্ত নেন। তবে তাদেরকে অবশ্যই ফ্যাসিষ্টদের বিরুদ্ধে থাকতে হবে"। এদেশীয় পার্টি-সদস্যরা তখন জর্জ ডিমিটভের সে অমোঘ ঘোষণার যথাযথ মূল্যায়ন

★ অনিল মুখার্জীর স্বদেশ, জাতিয়তাবাদ ও স্বাধীনতা শীর্ষক নিবন্ধ (মুক্তির দিগন্ত, মে ১৯৮২ সংখ্যা)

করতে পারেননি। আর পারেননি বলেই ১৯৪২ সালে জাপানের আক্রমণে ইংরেজগণ যখন ভারত থেকে প্রায় পাত্ গুটাবার অবস্থায় এসেছিলেন তখনও তারা সে যুদ্ধকে জন-যুদ্ধ বলেই প্রচার করে বেড়ায়েছেন। প্রসঙ্গতঃ আরও লক্ষণীয় যে, ১৯৪৫ সালে বোম্বের নৌবিদ্রোহে দেশটি যখন উন্মোক্ত হবার আর একটি মওকা পেয়েছিলো তখনও তারা ঐ একই কারণে বিদ্রোহীদের সামান্যতম সহায়তাও করেননি! সর্বোপরি ১৯৪৫ সালের শেষের দিকে কিষাণ সমিতির উদ্যোগে হায়দ্রাবাদের তেলেংগনায় কিষাণগণ বিদ্রোহ করে যখন গ্রামকে গ্রাম মুক্ত করে ফেলে, তখনও পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি সে বিদ্রোহে সহায়তাতো করেনইনি উল্টে বরং দোষারোপ (কন্ডেম্ড্) করেছেন। আবার এদিকে ১৯৪৬ সালে ইংরেজগণ যখন আজাদ হিন্দ ফৌজের (আই, এন, এ-র) বীর যোদ্ধা রাশেদআলী প্রমুখকে বন্দী করে কোর্টমার্শালে বিচার করে, তখনই পার্টি তার পূর্বের বোল পাল্টে বলতে থাকে-'সেরিগেলি সরকারকো আর এক ধাক্ লাগাও। রাশেদ আলী—জিন্দাবাদ'—ইত্যাদি। স্মরণ করান যেতে পারে যে, ঠিক সে সময় ইংরেজ সরকার আদতে কিন্তু সেরিগেলি (টলটলয়মান) ছিলনা। তারা তখন যুদ্ধের ধলক উতড়ে বেশ কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থার এসেছিল বলেই আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর সেনাদের বিচার করছিলো। লক্ষ্যনীয় যে, ঐ আজাদ হিন্দ ফৌজের সহায়তায় জাপানীদের আক্রমণে ইংরেজ সরকার যখন খাবি—খাচ্ছি করছিলো, ঠিক সেই সেরিগেলি অবস্থায় এ পার্টি'ই বলে বেড়ায়েছে—'এ যুদ্ধ (জার্মানির বিরুদ্ধে ইংরেজ প্রভৃতির) জনযুদ্ধ"। আরও উল্লেখ্য যে, ১৯৪৩ সালে কৃষক সভা কর্তৃক প্রকাশিত একটি দলিলে শ্রেণীশত্রু সম্পর্কে তারা নিম্নলিখিত বক্তব্যও পেশ করেছেন:

খাবার ফসল বাড়লে শ্রেণী হিসাবে কৃষকদের বিরুদ্ধে জমিদার শ্রেণীর লাভ বা শোষণ বাড়বেনা, লাভ হবে দেশের—জাতির। কিন্তু ফসল না বাড়লে সুবিধে হবে পঞ্চম বাহিনীর এবং বিপদ বাড়বে কৃষক শ্রেনীর

ও জাতির। এই অবস্থায় কৃষক শ্রেণীর শত্রু জমিদার নয়, পঞ্চম বাহিনীই (আজাদ হিন্দ ফৌজই) কৃষক শ্রেণীর শত্রু জাতির শত্রু ★

স্মর্তব্য যে, মার্কসিষ্টরা সে সময় (১৯৪০ সালে যদি কিছুটাও বৃটিশ বিরোধী কাজ করতেন, তবে সাত চল্লিশ সালে ইংরেজরা অত সহজে তাদেরই সৃষ্ট প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে পারতেননা। তাছাড়া সে সময়ে তারা সক্রিয় থাকলে ১৯৪৬ পরবর্তী কালে কোলকাতা, পাঞ্জাব, বিহার প্রভৃতি অঞ্চলে যে বর্বরোচিত সাম্প্রদায়িক দাংগা ★★ হয়েছে—সভ্যতা ও মানবতার চরম কলঙ্ক সে দাংগা-সম্পূর্ণ না হলেও অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণে বন্ধ করা যে যেতো তানিশ্চিত।

আরও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯৪৭ সালে পাক-ভারত বিভক্তির পর মিঃ পি, সি, যোসীর নেতৃত্বেই পার্টি প্রস্তাব নেয় যে, বিদেশী ইংরেজ সরকার উৎখাতের মাধ্যমে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হয়েছে। এবার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য প্রয়োজন পাক ভারতের ক্ষমতাসীম সরকারদ্বয়কে সমর্থন করা। উক্ত প্রস্তাব যেমনি ছিল ডানপন্থী বিচ্যুত তেমনি পরবর্তী ১৯৪৮ সালে মিঃ রণডিভে পার্টি সেক্রেটারী হয়ে—"লাখ ইনসান ভূখা হায়, এ আজাদী ঝুটা হায়। দেশে বিপ্লবী পরিস্থিতি পরিপক্ক, এখনই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব করতে হবে"। —ইত্যাদি সিদ্ধান্তও ছিল তদনুরূপই বাম বিচ্যুত। আদতে ১৯৪৮ সালের বিভক্ত দেশদ্বয়ের পার্টি নেতা ও কর্মীরা নিজেরাই ছিলেন বিচ্ছিন্ন, তখন

☆ বদরুদ্দীন উমরঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলাদেশের কৃষক।

☆☆ সভ্যতা ও মানবতা বিরোধী সে দাঙ্গায় কোলকাতায়গুলী - বিদ্ধ, ছুরিকাহত এবং অগ্নি দগ্ধ হয়ে মৃত্যু বরণ করেছে দু'হাজার মানব-সন্তান। তদুপরি বহু নারীও পাশবিক অত্যাচারের শিকারে পরিনত হয়েছে। এদের সংখ্যা বিশ হাজারের কম নয়। প্রায় সাড়ে সাত লাখ লোক নিহত হয়েছিলো পাঞ্জাবের রক্তক্ষয়ী দাংগায়।—লিওনাদ মোসলেঃ ভারতে বৃটিশ রাজত্বের শেষ অধ্যায়।

তাদের বিপ্লবে প্রস্তুতির প্রশ্নই অবান্তর। তাই সে সুযোগে মুসলিমলীগ সরকার কঠোর হস্তে সে আন্দোলন দমন করেন। বস্তুতঃ ইতিপূর্বকার ধর্মীয় যোসে আপ্লুত এদেশীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকে হঠাৎ করে ১৯৪৮ সালের সে আন্দোলনের পক্ষে আনার অবকাশই ছিলনা। ঐ সব কারণেই তৎকালীন ফ্যাসিবাদী সরকার বিপুল সংখ্যক পার্টি কর্মীকে জেলেপুরে এমন অত্যাচার ও নির্যাতন করে, যার পরিণতিতে অসংখ্য হিন্দু ক্যাডার সে সময় দেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন। স্মরণ করান যেতে পারে যে, সে সময় বিষ্ণুদা সে সব থিসিজ না কপচিয়ে মার্কসীয় তত্বের সঠিক প্রয়োগ ঘটায়ে কৃষকদের সাথেই থেকেছেন এবং তাদেরকে সংগঠিত করে বাক-সর্বস্ব থিসিজবাদীদের শিক্ষা দিয়েছেন।

পঞ্চাশ দশকের রাজনৈতিক পেক্ষাপটের পরবর্তী অংশ পরে আলোচন করা যাবে। এবার আমরা শোভনার ছুর্ভিক্ষাবস্থার কথায় ফিরে যাই।

পঞ্চাশের মন্বন্তরে, লঙ্গর খানা, শুশ্রুসা টিম ও সালিস কমিটি গঠন

সে ঘোর ছুর্দিনে শোভনার কৃষককূল ভাতের অভাবে দিনের পর দিন শাক-শব্জী, কচু-ঘেচু খেয়ে ধুকে ধুকে মরার উপক্রম হচ্ছিল; একমুটি ঘাসের অভাবে গরু, মহিষ যখন উৎসন্নে যাচ্ছিলো, তখন কৃষক সমিতির কর্মীবৃন্দ তুলনামুলক অবস্থা সম্পন্ন ব্যক্তিদের বাড়ী ঘুরে ধান-চাল সংগ্রহ করে প্রতাপ মল্লিকের বাড়ীর সম্মুখের মণ্ডপে জড় করে এবং সেখানে লঙ্গর খানা খুলে দীর্ঘ আটমাস যাবত ভুখা-নাঙ্গাদের ছু'বেলা খাইয়ে প্রাণে বাঁচিয়ে রাখে। তাছাড়া সে সময় অখাদ্য-কুখাদ্য

খাওয়ার দরুণ দুর্ভিক্ষ উত্তর-কালে যখন মহামারী দেখা দেয়, তখন কৃষক সমিতির লোকেরা তাদের সাধ্য ও সামর্থ অনুযায়ী একটি শুশ্রূষা টিমও গড়ে তোলে। সে শুশ্রূসা টিমে ছিলেন ডাক্তার নগেন্দ্র নাথ মল্লিক। আর তাকে সাহায্য করেছেন সন্ন্যাসী মণ্ডল, মনিন্দ্র কুমার হরি. গোপাল আশ, রঞ্জন ব্রহ্ম, শশী ভূষণ বিশ্বাস প্রমুখ।

উল্লেখ্য যে. আলোচ্য সময় শোভনা তথা ডুমুরিয়ায় সরকারের কোন অস্তিত্ব ছিলনা বললেই চলে। তাই দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের কথাও উঠেনা। সমিতির বিরুদ্ধবাদীদের কেউ তখন ডুমুরিয়ায় কোন কেস করতে গেলে পুলিশ তা গ্রহণ না করে খুলনা থানায় যাবার পরামর্শ দিতো। কৃষক সমিতির সে সময় শালিসী কমিটি করে নিজেদের বিচার নিজেরাই করতো।

আরও উল্লেখ্য যে, ১৯৫০ সালে দক্ষিণ খুলনা তথা—পাইকগাছা, আশাশুনি, দাকোপ প্রভৃতি অঞ্চলে আর এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়েছে। সে দুর্ভিক্ষে দশ হাজার কৃষক ও ক্ষেত মজুরের মৃত্যু হয়েছে। দুর্ভাগ্য হলেও সত্য যে, সে সময় মুখ্যমন্ত্রী জনাব নুরুল আমিন বলে বেড়ায়েছেন যে. সে মৃত্যু নাকি খাদ্যের অভাবে হয়নি— পুষ্টির অভাবেই হয়েছে। ধিক শত ধিক, গণ-মানুষের মৃত্যু নিয়ে এমন পরিহাস এ দেশেই সম্ভব। সভ্য সমাজে এমন হীন উক্তি করা দূরে থাক, অনুরূপ হীন চিন্তা করলেও জনগণ লজ্জায় হেট হয়ে যেতো।

চাউলের মূল্য বৃদ্ধির সাথে খাজনা ও মজুরী প্রবৃদ্ধির হার

স্মরণ করা যেতে পারে যে, উল্লেখিত তিতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ পূর্ববর্তী চল্লিশ-একচল্লিশ সালে চাউলের সের প্রতি মূল্য ছিল পাঁচ-ছয়

পয়সা। তিতাল্লিশ সালের দুর্ভিক্ষের সময় তা বেড়ে হঠাৎ দাঁড়ায় চৌদ্দ আনায়। সে অবস্থায় সরকার বার্মা থেকে চাউল এনে অজস্র ভাবে খোলা বাজারে ছেড়ে দিলে সে বাজার দর পড়ে গিয়ে বার্মার (রেংগুনের মোটা) চাল পাঁচ আনা আর দেশীয়টা হয় ছয় আনা। স্মর্তব্য যে, পাকিস্তান আমলের মধ্যভাগ পর্যন্ত চালের ঐ একই দাম ছিলো। আটষট্টি সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় বারো চৌদ্দ আনায়। অতঃপর একাত্তর সালে তা আর এক ধাপ বেড়ে পাঁচ সিকি পর্যন্ত উঠানামা করতে থাকে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, উনিশ' তিতাল্লিশ সালে যুদ্ধের প্রকোপে ইংরেজ সরকার প্রয়োজনের তাগিতে অজস্র কাগুজে মুদ্রা ছাপায়। তাতে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। আর তদদরুণই দ্রব্যমূল্য হু হু করে বাড়তে থাকে। কিন্তু ঐ দ্রব্যমুল্য বৃদ্ধির সমান হারে কৃষকদের মজুরী বৃদ্ধি হয়নি। ফলে ঐ দুর্ভিক্ষের সময় বাজারে চাল পাওয়া গেলেও কৃষক মজুরের তা ছিল ক্রয় ক্ষমতার বাইরে। আর ক্রয় ক্ষমতার বাইরে ছিল বলেই সে দুর্ভিক্ষে বাংলার বুকে লাখ অভুক্ত কৃষক-শ্রমিক মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছে।

প্রসংগতঃ আর একটি কথা স্মরণ করানো যেতে পারে যে, বৃটিশ-বাংলা, পাক-বাংলা, আর বর্তমান বাংলায় চালের দাম যে হারে বাড়ছে সে হারে কৃষক-শ্রমিকের মজুরী বাড়েনি বলেই পাক আমলে এদেশীয় অনেকে আক্ষেপ করে বলেছে – এর চেয়ে ইংরেজ আমলেই বরং ভালো ছিলাম।

কৃষক-মজুরের উপরোক্ত আক্ষেপের কারণ আরও পরিস্কার করার জন্য বলা যেতে পারে যে ১৯৪০/৪১ সালে জন খাটা যে মজুর দৈনিক মজুরী পেতো দু'টাকা, তাদিয়ে তারা স্বচ্ছন্দে ২/৩ সের চাল কিনে অবশিষ্ট পয়সায় তেল, নুন, মাছ ইত্যাদি কিনতে পারতো। সে

মজুরই ১৯৬৮ সালে দৈনিক মজুর পেতো তিন, সাড়ে-তিন টাকা। আর তখন চালের দাম ছিল প্রতি সের বার-চৌদ্দ আনা। অর্থাৎ অর্জিত মজুরী দিয়ে তারা তখনও আর কিছু না হোক অন্তত তিন সের চাল স্বচ্ছন্দে কিনতে পারতো। আর বর্তমানে দু'একদিন বাদ দিয়ে যদিও বা একদিন কাজ পায় তবে পারিশ্রমিক পায় ১৫/২০ টাকা। এদিকে চাউলের সের প্রতি দাম উঠেছে সাড়ে সাত-আট টাকা। অর্থাৎ একদিনের শ্রম মুজরী দিয়ে পূর্বোক্ত তিন সের চালই কেনা সম্ভব নয়— জামা, কাপড়, তেল, নুন কেনাতো বাদই গেছে।

চালের মূল্য ও মজুরীর সাথে সাথে জমির খাজনার উর্ধগতির কয়েকটি উদাহরণ দিলে কৃষক-মজুরের দুরাবস্থার কারণটা আরও পরিস্কার হবে। আর তাতে দু'একটি নজিরই যথেষ্ট বিবেচনা করি। খুলনা জেলার খালিশপুর গরগনার বানিয়াখামার মৌজার সেহার নং-৪৮-এ ১'০৩ (এক একর তিন শতক) জমির মালিক ছিলেন নাবালক অজিত-বিজিত রায়ের অভিবাবিকা সতীলক্ষী দেবী। বাংলা ১৩৩৯ থেকে ১৩৫৯ অর্থাৎ ইংরেজী ১৯৩৩ থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত ঐ সমুদয় জমির খাজনা ছিল ১৸৶৬ (এক টাকা সাড়ে পনের আনা) মাত্র। পাক আমলে ১৩৬৯ সাল অর্থাৎ ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে ঐ সমুদয় জমির মধ্যে মাত্র ০'৯৭ (সাতানব্বই) শতক জমির খাজনা হয়েছে ১০'১৩ (দশ টাকা তের পয়সা)- যার দাখিলা নং— জে ৭৪১২৪০ তারিখ ৪/৪/৬৩। আবার ১৩৮১ সাল অর্থাৎ ১৯৭৭ খৃষ্টাব্দে ঐ খাজনা বৃদ্ধি পেয়ে উক্ত ০'৯৭ শতক জমির মধ্যে মাত্র ০'৪৮ (আটচল্লিশ) শতকের খাজনা হয়েছে ৭'২৬ (সাত টাকা ছাব্বিশ পয়সা) দাখিলা নং- জে ৮২২২৪৭ তারিখ-৯/৪/৭৭।

উল্লেখ্য যে, ১৯৭৩ সালে সরকার বহু ঢাক-ঢোল পিটায়ে ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুপের কথা বলে উন্নয়ন ও অন্যান্য সেচ আদায়ের যে ব্যবস্থা করেছেন তাতেই মাত্র ০'৪৮ শতক

জমির খাজনা হয়েছে ৭'২৬ পয়সা। অতঃপর আর রাখ-ঢাক না করে ১৩৮৬ সালে প্রতি শতাংশ জমির খাজনা ধার্য করা হয় ৩'০০ হারে। পরের বছরই অর্থাৎ ১৩৮৭ সালে উহা দ্বিগুণ করে প্রতি শতাংসের খাজনা আদায় করা হয় ৬'০০ হারে। তার পর ১৩৮৯ সালে তারও দ্বিগুণ বেড়ে প্রতি শতকের হয় ১২'১০। পাঠক মাত্রই এসব অবহিত আছেন। ☆ তাই কলেবর বাড়ায়ে লাভ নেই।

মোদ্দা কথা, সাত চল্লিশ আর একাত্তর সালে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে যে স্বাধীনতার কথা বলা হচ্ছে তাতে কৃষক শ্রমিক তথা আপামর জনতার অর্থনৈতিক কোন মুক্তি আসেনি, বরং এসেছে তাদের অবস্থার ক্রমাবনতি। তবে হঁ্যা, কৃষক-শ্রমিকের ঐ ক্রমাবনতির সাথে সাথে দেখা যাবে যে উৎপাদন ক্রিয়ার সাথে জড়িত নয় এমন মুষ্টিমেয় পর-শ্রম লুন্ঠনকারী-ইংরেজ আমলে যাদের ছিল একটি মাত্র টিনের ঘর, পাক আমলে তাদের কেউ কেউ ক্ষমতার অংশীদায়িত্ব নিয়ে করেছেন দালান। আবার পাক আমলে যাদের ছিল যেনতেন প্রকারের একটি দালান, একাত্তর উত্তরকালে ঐ প্রক্রিয়ায় তাদের হয়েছে বিরাট প্রাসাদ; আর তার সাথে সাথে হয়েছে প্রচুর ব্যবসা ও বিত্ত।

অতএব একে মুক্তি না বলে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতার হাত বদল বলাই শ্রেয়। সাদা চামড়ার যায়গায় বাদামী চামড়া, আবার বাদামী চামড়ার জায়গায় কালো চামড়ার হাত বদল হয়েছে মাত্র — রাষ্ট্রিয় কাঠামো ও শোষণ প্রক্রিয়া অপরিবর্তিতই রয়েছে। দেশের শতকরা আশি ভাগ কৃষক-শ্রমিক যারা গায়ের রক্ত পানি করে উৎপাদন করে তারা যতক্ষণ পর্যন্ত রাষ্ট্রিয় ক্ষমতায় শরীক না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত দৈহিক খেটে উৎপাদন করেনা মুষ্টিমেয় এমন পরশ্রমজীবী পরগাছা ক্ষমতার অংশীদায়িত্ব নিয়ে সমাজকে শোষণ করবেই। বস্তুতঃ শোষণের

★জন মজুরী ও খাজনার যে বিবরণ দেয়া হলো তা ১৯৮৩ সালে শহর থেকে সংগৃহীত হয়েছে—লেখক।

পথ উন্মোক্ত রেখে কেউ যদি দ্বিতীয় বিপ্লবের ডাক হাকে বা ভূমি সংস্কার, এমন কি শোষণহীন সমাজ গড়ার বা জমির আইল তোলা বিপ্লবের কথা বলে তবে বোকাদের আরও বোকা বানানোই যাবে— শ্রমিক কৃষকদের সামান্যতম উপকারও হবে না। শোষণের সত্যিকার অবসান করতে হলে যারা নিজ হাতে চাষ করে না তাদের কাছ থেকে জমি কেড়ে নিয়ে প্রকৃত কৃষকদের হাতে তা দিয়ে দিতে হবে। আবার ঐ দেয়া জমিও যাতে দেনার দায়ে পুনরায় অকৃষকদের হাতে চলে না যায় তার পুর্ণ গ্যারান্টিও দিতে হবে। মোদ্দা কথায় ব্যক্তি পুঁজি মালিকানার অবসান ঘটাতে হবে।

অধুনা অনেককে প্রশ্ন করতে শুনা যায় যে, এদেশের জমিতে বর্তমানে বোরো ও ইরি ধান ছাড়াও গম, ভুট্টা, ছাতু প্রভৃতি উৎপন্ন হয়- যা পাক আমলের মধ্য ভাগেও হয়নি। তাছাড়া আজকাল মানুষের চুল থেকে আরম্ভ করে ব্যাংগের ঠ্যাং পর্যন্ত এদেশীয় পণ্য বিদেশে রপ্তানী হয়ে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রাও অর্জিত হচ্ছে—যা পাক আমলেও হয়নি। তবুও শ্রমিক-কৃষক তথা আপামর জনতার আর্থিক এ ক্রম-বনতির হেতু কি?

উল্লেখ্য, পাক আমলের ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদীদের লগ্নী পুঁজির পরিমাণ ছিল ১৬০০/— (ষোলশ' কোটি টাকা) আর বর্তমানে (১৯৮১ সাল পর্যন্ত) সে লগ্নি পুঁজির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১২,০০০/— (বার হাজার কোটি) টাকা। ★ ডাঃ সাইফউদ-দাহার ১৯৮৩ সালের একটি সংকলনে লিখেছিলেন "লিখিত হিসাব মত এ পর্যন্ত সরকারী লোন দাড়ায় ২৮,০০০/— কোটি টাকা যার বাৎসরীক সুদ ৩০০/— (তিন শ') কোটি টাকা। অর্থাৎ পূর্বের একটি ঋণ ও তার সুদ পরিশোধ করার জন্যই

★ ডাঃ সাইফউদ দাহার : বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ শীর্ষক নিবন্ধ।

সাংস্কৃতি আশ্বিন— ১৯৮১।

নুতন নুতন ঋণ গ্রহণ করতে হচ্ছে। তার থেকে সাধারণ মানুষের উন্নতি তথা দেশ উন্নয়নের মুলধন আসবে কোথা থেকে? তদুপরি ইংরেজ আমলে যেখানে আমরা মুখ্যতঃ এক বৃটিশ সম্রাজ্যবাদের অধীনে ছিলাম, সেখানে দুনিয়ার তামাম সম্রাজ্যবাদীদের লগ্নী পুঁজির ঋণে আজ আমরা অর্থনৈতিক পরাধীনতায় আষ্টে-পৃষ্ঠে আটকা পড়ে আছি। কোন বুর্জোয়া শাসকই কস্মীনকালেও সে পরাধীনতা থেকে মুক্ত করতে পারবে না।

দুর্ভিক্ষের কারণ ও পরিণতি

যাক যা বলছিলাম পূর্বের সে কথায় ফিরে যাই।

১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ ছাড়া আরও বহু ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ এ হতভাগা দেশে কৃষক শ্রমিকদের অনুরূপ মৃত্যু ঘটিয়েছে। সে প্রসংগের বিশদ আলোচনার অবকাশ যদিও এখানে নেই, তবুও যেহেতু কৃষক ও তার ফসল হানির সাথে দুর্ভিক্ষ ও তৎদরুণ কৃষকদের মৃত্যুর সম্পর্ক ওত—প্রোত ভাবে জড়িত সেইহেতু বহু দুর্ভিক্ষের মধ্যে গুটি কয়েক মাত্র উল্লেখ করে সে দুর্ভিক্ষের কারণ উদঘাটনের চেষ্টা করবো।

বাংলা ১১৭৬ সালে আর এক ভয়াবাহ দুর্ভিক্ষ হয়েছে। তাতে এক কোটি বা এক তৃতীয়াংশ বাংগালী মারা গেছে। অনুরূপ প্রতিটি দুর্ভিক্ককেই অদৃষ্টবাদী বাংগালীরা নিজ নিজ অদৃষ্টের পরিহাস বা কপালের লিখন বলে নিজেদের দোষারোপ করেছে। অনেকে আবার ঐ দুর্ভিক্ষাবস্থায় সমৃদ্ধির আশায় রুদ্র দেবতার তুষ্টির উদ্দেশ্যে ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে নরবলিও দিয়েছে। উল্লেখ্য যে, ১৮৬৬ সালে যশোর জেলায় দুর্ভিক্ষ যাতে না হয় তার জন্য নরবলি দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের যে সব এলাকায় সর্বপ্রথম লোক বসতি হয়েছিল যশোর

জেলা (আলোচ্য সময় খুলনাও যশোর জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল) তার মধ্যে অন্যতম। শিক্ষা-দীক্ষায় সর্বাধিক অগ্রসর জেলাগুলির মধ্যে যশোর অন্যতম। প্রায় সাত বছর বয়সের একটি মুসলমান বালককে লক্ষী-পাশা কালী মন্দিরের (কালী শিবের স্ত্রী) সংলগ্ন হাড় কাঠের কামরায় পাওয়াগেছে। তার ঘাড় হাড় কাঠে আটকানো এবং ঘাড় কাটা ছিল। তার জিহ্বা বেরিয়ে এসে দু'পাটি দাঁতের মাঝখানে আটকে রয়েছে। চোখে দু'টি খোলা এবং দেহের কয়েক জায়গায় রক্ত জমাট বেঁধে রয়েছে। বালকটির সারা দেহ সম্পূর্ণরূপে নগ্ন, ঘাড়ে খুনদার দু'টো কোপ (ইস কি নির্মম-লেখক) দেখা যাচ্ছে। *

এখানে একটু খতিয়ে দেখলেই দেখা যাবে যে প্রতিটি দুর্ভিক্ষই ছিল প্রকৃত পক্ষে মানুষেরই সৃষ্টি। শাসকদের অদূরদর্শীতা ও সময়োচিত ব্যবস্থা গ্রহণের অভাবেই দুর্ভিক্ষ হয়ে থাকে। ফ্রান্সের বিখ্যাত ঐতিহাসিক পিনে দুক্লো যথার্থই বলেছেন "খাদ্য দান করে প্রকৃতি আর দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে মানুষ।" লোভী ব্যবসায়ীগণ অধিক মুনাফার লোভে ধান-চাউল গুদাম জাত করে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টিকরে। মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারের এক কপর্দকহীন কর্মী চাউলের ব্যবসা করে দুর্ভিক্ষ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ৬০ হাজার প্রাউণ্ড (দেড় লক্ষাধিক টাকা) ইউরোপে পাঠিয়েছেন **

আলোচ্য ছিয়াত্তরের মন্বন্তর প্রসংগে জর্জ টমসনের মন্তব্য ছিলো ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দের পূর্বে হিন্দু-মুসলিম শাসকগণ দেশবাসীর ব্যবহারের জন্য এবং দেশের মঙ্গলার্থে যে সকল রাজপথ (উল্লেখ্য যে, আওরংগজেবের পর থেকে আলোচ্য সময় পর্যন্ত এদেশে নুতন কোন রাস্তা-ঘাট

---

* ডাবলিউ ডাবলিউ হাণ্টার: পল্লী বাংলার ইতিহাস।

** সুপ্রকাশ রায়, ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন।

ও জনপথ সংস্কার বা নুতন তৈরী হয়নি), পুস্করিনী ও খাল তৈরী হয়েছিল সেগুলো জীর্ণ ও অব্যবহার্য হয়ে পড়তে দেয়া হয়েছিল। আর বর্তমানে সে ব্যবস্থার অভাবে বারংবার দুভিক্ষ দেখা দিচ্ছে। ★

পূর্বোক্ত ১৭৭০ সালে যে ঘোর দুভিক্ষ হয়, তা হয় বাংলা ১১৭৬ সালে। সে কারণেই সে মন্বন্তরকে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বলা হয়ে থাকে। সে মন্বন্তরে জন সংখ্যার পঁয়ত্রিশ ভাগ এবং কৃষকদের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ মারা যায়। বৃটিশ কোম্পানী আমলের প্রথম ভাগে যেখানে টাকায় ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ সের চাল পাওয়া যেতো, সেখানে মন্বন্তরের সময় দাম বেড়ে গিয়ে টাকায় মাত্র তিন সের চাল পাওয়া যেতো।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের প্রথম দিকে মানুষ গাছের পাতা এমনকি ঘাস পর্যন্ত খেয়ে জীবন ধারণের চেষ্টা করে। পরে তারা মৃতের মাংশও খেতে শুরু করে। অতঃপর বেঁচে থাকা আধ মরাদের দিনে দুপুরে কুকুর, শৃগাল আর শকুনে টেনে নিয়ে যে কি নির্মম ভাবে খেয়েছে তা প্রত্যক্ষদর্শী তৎকালীন এদেশীয় পদস্থ ইংরেজ অফিসার—মিঃ জন শোরের হৃদয় নিংড়ানো আহজারী সূচক কবিতায় পাওয়া যায় :—

★ ডাবলিউ ডাবলিউ হান্টার: পল্লীবাংলার ইতিহাস।

মৃতের পাশে পড়ে আছে মৃত প্রায়,
ঐ শোন শিয়াল ডাকছে,
শকুনি চিৎকার করছে
কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে,
দিনে দুপুরেই তারা মরা আর
মৃত প্রায় মানুষ নিয়ে
টানা হেঁচড়া আর কাড়াকাড়ি করছে,
তাদের বাধা দেওয়ার মতো
কেউ আর নেই,
মৃতের সংগে মৃত প্রায় মানুষও
আজ তাদের শিকার।

ধিক্, শত ধিক্, এখানে পিনে দুক্রোর মন্তব্য পুনরায় স্মরণ করান যেতে পারে: খাদ্য দান করে প্রকৃতি, আর দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে মানুষ।

উল্লেখ্য যে, এদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধকে জন যুদ্ধের বুলি কপচিয়ে প্রকারান্তরে ইংরেজদের সহায়তা না করলে পঞ্চাশের মন্বন্তর প্রপীড়িত কৃষকদের জংগী মনোভাবের সুযোগটাও অন্ততঃ তারা গ্রহণ করতে পারতো।

লক্ষণীয় যে, প্রতিটি দুর্ভিক্ষ পরবর্তী কালেই দুর্ভিক্ষ প্রপিড়ীত শ্রমিক-কৃষক, শাসক-শোসকের বিরুদ্ধে জংগী মনোভাব গ্রহণ করে থাকে। ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষের পর ১৭৭১ খৃষ্টাব্দের ১লা মার্চ ময়মনসিং-এর মধুপুর জংগলের কাছে বিদ্রোহীদের হাতে প্রাণ দেন ক্যাপ্টেন এ্যাডওয়ার্ড আর রংপুরের শ্যামগঞ্জ ময়দানে ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের ৩০শে ডিসেম্বর প্রাণ দেন ইংরেজ সেনাপতি টমাস। ★

বাংলাদেশে পুনঃ পুনঃ দুর্ভিক্ষ আর ঐ দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত কৃষকদের মংগলামংগল সংক্রান্ত একটি বিভ্রম (ইলুশন্) এর কথা পরবর্তী অধ্যায়ে উল্লেখ করেই এ প্রসংগের সমাপ্তি টানছি।

☆ সুপ্রকাশ রায়: ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন।

ঋণ শালিসী বোর্ড ও প্রজাসত্ব বিল

অধুনা এদেশে অনেককেই মাঠে ময়দানে বক্তৃতা করতে এমনকি বই পুস্তকে লিখতেও দেখা যায় যে, বাংলার ঋণ শালিসী বোর্ড ও প্রজাসত্ব অধিকার বিল নাকি অমুক-তমুক জনদরদী কৃষকদের দুঃখে দুঃখীত হয়েই উপস্থাপন ও পাশ করেছেন। এটা কৃষক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় বিধায় প্রকৃত ঘটনাটি বর্ণনা প্রয়োজন।

উল্লেখ্য যে, ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিশ যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেছিলেন, তাতে স্থির হয় যে, জমিদারেরা সরকারকে প্রতিবছর ২,৬৪,০০,৯৮৯ টাকা রাজস্ব দিবে। এই রাজস্ব জমিদারের আদায়ের দশ ভাগের নয় ভাগ। আঠারো শতকের প্রথম দিকে জাফর খাঁ এবং সুজা খাঁ যে রাজস্ব আদায় করতো, উহা তাহার দ্বিগুন। ★

তার সাথে তিনি সূর্যাস্ত আইনও করেছিলেন। সে আইনের মাহাত্ম ছিলো :

" কোন জমিদার নির্ধারিত দিন সূর্যাস্তের পূর্বে সরকারের কাছে তার দেয় খাজনা পরিশোধ করতে না পারলে তার জমিদারী খারিজ হয়ে যাবে" ।

প্রবাদ আছে যে, এতদাঞ্চলের জনৈক জমিদার কোলকাতা গিয়ে শিব প্রতিমা কিনে নৌকা যোগে দেশে ফিরছিলেন। পথিমধ্যে খবর পৌঁছে যে, নির্ধারিত দিন সূর্যাস্তের পূর্বে খাজনা পরিশোধ করতে না পারায় তার জমিদারী খারিজ হয়ে গেছে। সে সংবাদে তিনি হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে প্রতিমাটিকে গংগা গর্ভে বিসর্জন দিয়ে বসেন।

★ রেবতী বর্মণ : সমাজ ও সভ্যতার ক্রম বিকাশ।

উক্ত আইনে জমিদারদের যে কেবল জমিদারীই গিয়েছে তাই নয় অনেককে কারাবরণও করতে হয়েছে।

কোন ক্ষেত্রে (সরকারের) বড় রকমের ঘাটতি—যেমন তিতুমীরের সাথে যুদ্ধে দেখা দিলে কালেক্টর জমিদারকে জেলে দিতেন এবং জমিদারীর দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করতেন। বাংলাদেশে দীর্ঘদিন যাবৎ ঘাটতি পড়াই অবশ্য স্বাভাবিক হয়ে পড়েছিল। ফলে নাবালক বা বিকৃত মস্তিস্ক না হলে কোন জমিদার যে কতদিন জেলের বাইরে থাকতে পারবেন তা তাঁরা নিজেরাও সঠিক ভাবে বলতে পারেন না। বিষ্ণুপুরের রাজা জেলে ছিলেন এবং বীরভূমের তরুন রাজাও সাবালক হওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই একই দশায় পড়েছিলেন। দুর্ভিক্ষের (১৭৭০ সালের) শেষ দিকে বর্ধমানের মহারাজা রাজকোষ সম্পূর্ণ শূন্য রেখে শোচনীয় অবস্থায় পরলোক গমণ করেন। ষোল বছর পর সরকারের দাবী পূরণ করতে না পারায় হতভাগ্য রাজ-পুত্রকে তার নিজের প্রাসাদেই বন্ধী অবস্থায় দেখতে পাই। ★

১৯২৯-৩১ সালে বিশ্ব আর্থিক সংকট বাংলাদেশের কৃষকদেরকেও ভয়ানক ভাবে আঘাত হেনেছিল। তাঁরা উত্তরোত্তর ভাবে মহাজনদের ঋণ জালে আবদ্ধ হয়ে জমি হারাচ্ছিলেন এবং আরও নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছিলেন। ★★

ঐ বিশ্ব অর্থনীতির মন্দাবস্থা থেকে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজরাও মুক্ত ছিল না (যুদ্ধ পূর্ববর্তী বছরগুলির ঐ মন্দাবস্থার দরুণ সা ম্রাজ্য-বাদীদের দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ বঁধান অপরিহার্য হয়ে পড়েছিলো)। আর তারই দরুণ ইংরেজ সরকার প্রতিবছরই খাজনা বৃদ্ধি করে। সরকার জমিদারদের উপর যে হারে খাজনা বৃদ্ধি করে জমিদার তার তিন-চার গুণ অধিক হারে খাজনা ধার্য করে কৃষকের উপর।

★ ডাবলিউ ডাবলিউ হান্টার: পল্লী বাংলার ইতিহাস:

★★ বদরুদ্দীন উমর: চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলাদেশের কৃষক।

ফলে কৃষকরা সে বর্ধিত খাজনা পরিশোধ করতে অক্ষম হয়। আর কৃষকদের সে অক্ষমতার কারণেই জমিদারগণও তাদের দেয়া টাকা পরিশোধ করতে পারে না। ঐ চক্রবর্তে জমিদার হারায় তার জমিদারী আর কৃষক হারায় তাদের কৃষির জমি। এ ছিল তদানিন্তন অর্থনীতির একদিক। অপর দিকে অর্থনৈতিক ঐ দুরাবস্থার দরুণ জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতাও নিদারুণভাবে বিঘ্ন ঘটে। আর তদদরুণ ১৯১৯ সালে চীনের কৃষক বিদ্রোহের ন্যায় এখানেও একটা বিদ্রোহের আলামত প্রস্ফুটিত হয়ে উঠে। তাই ইংরেজ সরকার প্রমাদ গুণতে থাকে। এদিকে ঐ অবস্থায় কোলকাতার বৃটিশ কাউন্সিলও ইংল্যাণ্ডকে সে পরিস্থিতি অবহিত করে। ইংরেজ সরকার তখন সে বিদ্রাহ ঠেকানোর উপায় নির্ধারণের উদ্দেশ্যেই ফ্লাউড্ কমিশন নিয়োগ করে। আর সে ফ্লাউড্ কমিশনের রিপোর্ট অনুসারেই ১৯৩৭ সালে প্রবর্তন করা হয় বেংগল টেন্যান্সি এ্যাক্ট ও ঋণ সালিসী বোর্ড।

উক্ত ট্যানেন্সি এ্যাক্টে রায়তদের জমি হস্তান্তরের সময় জমিদারকে সেলামী দেবার প্রথা বিলোপ করা হয়। উল্লেখ্য যে, ১৯২৮ সালের ট্যানেন্সি এ্যামেণ্ডমেন্ট এ্যাক্ট রায়তদের জমি হস্তান্তরের অনুমতির জন্য জমি বিক্রয় মূল্যের এক পঞ্চমাংশ টাকা সেলামী দিলে মালিক-জমিদার জমি হস্তান্তরের অনুমতি দিতেন। সে আইনে রায়তদের জায়গায় মালিকের অনুমতি সাপেক্ষে ঘর তোলা ও গাছপালা কাটার অধিকারও দেওয়া হয়েছে—যা তৎপূর্বে ছিলনা।

আবার ১৯৩৮ সালের বেংগল এগ্রিকালচারাল ডেটর্‌স্ এ্যাক্টে গ্রাম্য সালিসী ব্যবস্থার বিধান করে দেয়া হয়। সে বিধানে ছিল যে, যেসকল কৃষকদের দেয় ঋণ সুদে-আসলে মূল ঋণের দ্বিগুণ হয় নাই, তারা মর্টগেজ দেয়া ঋণের টাকা বিশ বছর কিস্তিতে পরিশোধ করতে পারবে। আর ইতিমধ্যে যারা মূল ঋণের সুদে-আসলে দ্বিগুণ

পরিশোধ করেছে ঋণ সালিসী বোর্ড তাদেরকে সে ঋণ থেকেও অব্যা-হতি দেবে। সেই বেংগল এগ্রিকালচারাল ডেটরস্ এ্যাক্ট—এর শব্দ সংক্ষেপে ছিল "বিএডি"। আর তাই জনসাধারণ তাকে পরিহাস ছলে বলতো ব্যাড (BAD) এ্যাক্ট।

উল্লেখ্য যে, ১৯২৮ সালের বেংগল টেন্যান্সি এ্যামেণ্ডমেন্ট এ্যাক্টে জমি হস্তান্তরের অনুমতির জন্য রায়তদের মালিককে (জমিদারকে) সেলামী দেয়ার বা রায়তের এলাকায় ঘর তোলা ও গাছ-পালা কাটার জন্য যে অনুমতি গ্রহণের বিধান ছিল ১৯৩৭ সালের এ্যাক্টে সে বিধা-নও বিলোপ করা হয়। মূল ট্যানেন্সি এ্যাক্ট পাশ হয় ১৯১৮ সালে। সে এ্যাক্টে জমির উপর জমিদারগণই ছিলেন সর্বেসর্বা। রায়তদের তা হস্তান্তরের অধিকার দূরে থাক, এমনকি মাথা গুটার ঘর তোলারও অধিকার ছিলনা।

১৯৩৭ সালে বেংগল টেন্যান্সি এ্যামেণ্ডমেন্ট এ্যাক্ট পাশ হওয়ার পর ১৯৩৮/৪০ সালে মানিল্যাণ্ড এ্যাক্ট বলে আর একটি এ্যাক্ট পাশ হয়। সে এ্যাক্টে যারা কৃষক নন তাদের ঋণও ১৯৩৭ সালের টেন্যান্সি এ্যামেণ্ডমেন্ট এ্যাক্টের অনুরূই পরিশোধ ও মওকুফের বিধান করে দেয়া হয়েছে।

অতএব ইংরেজদের স্বার্থেই যে ফ্লাউড্ কমিশন নিয়োগ করা হয়েছিল এবং ঐ কমিশনের সুপারিশ কার্যকরী করার জন্যই যে ১৯২৭ সালের টেন্যান্সি এ্যাক্ট ও ১৯৩৮ সালের বেংগল এগ্রিকাল-চারাল ডেটর্ স্ এ্যাক্ট পাশ করে একটা আসন্ন বিপ্লবকে যে ঠেকানো হয়েছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা। প্রায় সেই একই সময়ে বিহার, উড়িষ্যা এমনকি আসামেও নাকি অনুরূপ ট্যানেন্সী এ্যাক্ট ও এগ্রিকালচারাল এ্যামেণ্ডমেন্ট এ্যাক্ট পাশ হয়েছে। কিন্তু সেখানে কেউ কৃষকদের মুক্তিদাতা সাজার এমন কোশেষ করেননি।

দুর্ভাগ্য হলেও সত্য যে, উপরোক্ত" ফ্লাউড কমিশনে বর্গা চাষীদের তেভাগা প্রদানের যে কথা ছিল, জনাব এ, কে, ফজলুর হক তাও কার্যকরি করেননি"। ★

শোভনা স্কুল প্রসঙ্গ

এবার জেলেখালীর পরবর্তী বাঁধের কথায় আসা যাক। তবে তার আগে শোভনা স্কুল প্রসংগে কিছু বলে নিই।

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের পূর্বে শোভনায় একটি মাত্র প্রাইমারী স্কুল ছিল, আর তাও চলতো ডিমেতালে। চল্লিশ দশকের শেষ পাঁচ-ছয় বছর নোনা জল ওঠে ফসল সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হওয়ায় লোকজনই যখন থাকতো অভুক্ত, তখন তাদের সন্তান সন্ততিদের সেই স্কুলেও পড়বার সংগতি ছিলনা। স্কুলটা তখন একরূপ বন্ধই হয়ে যায়। ইতিমধ্যে বিষ্ণুদার নেতৃত্বে শাখাবাঁকী ও জেলেখালী বাঁধ হওয়ায় জমিতে "বাম্পার ক্রপই" ফলতে আরম্ভ করেনি, তখন থেকে দু'ফসলও ফলতে আরম্ভ করে। আর তাতে জনগণের আথিক অবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তনও ঘটতে থাকে। মাঝখানে ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে দেশ জোড়া দুর্ভিক্ষের সময় কৃষক সমিতির বলিষ্ঠ নেতৃত্বে স্থানীয় লোকজনের দুঃখ দুর্দশাও প্রশংসনীয় ভাবে উৎরে যায়।

অতঃপর ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে বিষ্ণুদা' কৃষক সমিতির সদস্য নগেন বাবু, জীবন বাবু (মাষ্টার মহাশয়), কুমার মিত্র (যিনি পরবর্তিতে দাকোপের ঐতিহ্যময় কৃষক আন্দোলনের প্রধান নেতৃত্ব দেন) প্রভৃতিকে নিয়ে ঐ প্রাইমারী স্কুলটিকে জুনিয়ার স্কুলে উন্নিত করেন এবং পার্টি সদস্য-দের দিয়েই স্কুল পরিচালনা ও শিক্ষকতা করান।

★ বদরুদ্দীন উমর: চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলাদেশের কৃষক।

স্কুলের তৎকালীন আনুক্রমিক প্রধান শিক্ষক ছিলেন বাবু পিযুষ কর, অনিল দাস গুপ্ত (চট্টগ্রাম কেসে ছাড়া পাওয়ার পর), সমর মিত্র প্রমুখ, আর সহকারী শিক্ষক ছিলেন বাবু স্বদেশ বসু, সুধীর মল্লিক, সুনীল বসু, বিভুতি বাবু, বৈদ্যনাথ বাবু প্রমুখ।

স্কুলটি তখন বেশ সুনামের সাথে পরিচালিত হয়। ১৭৫২ সালে অর্থাৎ ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে সেখানে বয়স্কদের শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থাও প্রবর্তন করা হয়—যখন সারা বাংলায় অপর কোন পল্লী অঞ্চলে দূরে থাক, এমনকি জেলা শহরগুলিতেও বয়স্ক শিক্ষার কথা চিন্তাই করা হয়নি।

এহেন একটি আদর্শ স্কুলকে তৎকালীন ইংরেজ এবং পরবর্তী-কালীন পাঞ্জাবী প্রভুরা কি হীন পন্থায়ইনা পুনঃ পুনঃ বন্ধ করে দিয়েছে সে কথায় পরে আসছি। এখানে সে বন্ধের কারণ প্রসংগে আপাততঃ এটুকুই বলা যায় যে, ঐরূপ আদর্শ স্কুল থেকে আদর্শবান ছাত্র-ছাত্রী বেরিয়ে আসতে থাকলে পরশ্রম আত্মসাৎকারী শাসক-শোসক শ্রেণীর ভিত যে টলটলায়মান হবে সে ভয়েই তারা সদা শঙ্কিত থাকতো। আর সে কারণেই স্কুলটা কারণে—অকারণে পুনঃ পুনঃ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

১৯৪৬ সালের দিকে স্কুলটি তিন-চার বছর সম্পূর্ণ বন্ধ থাকার পর পুনরায় চালু করা হয়। আবার ১৯৭১ সালে খান সেনারা একবার লঞ্চ নিয়ে অপারেশনে এসে ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে কিছু সময়ের জন্য ঐ স্কুলে আশ্রয় নেয়। সাময়িক সে আশ্রয়স্থল থেকেই খান সেনারা মুক্তি বাহিনীর অন্যতম নেতা, অধ্যাপক খালেদ রশীদ সাহেবকে (গুরুকে) ধরে নিয়ে মেরে ফেলে।

বিষ্ণুদার সম্মোহনী

স্কুল প্রসংগটি আপাততঃ বন্ধ রেখে বিষ্ণুদার কতিপয় সম্মোহনী

গুণের কথা বলা যাক।

শাখাবাঁকী বাঁধ দেবার পূর্বে একদিকে দারিদ্র আর অপর দিকে জমিদারদের কূটচালে পরস্পর রেষারেষিতে লিপ্ত কৃষকদেরকে সংঘবদ্ধ করা শুধু দুরুহই নয় দুঃসাধ্যও ছিল। বিষ্ণুদার এক অকল্পনীয় সম্মোহনী গুণে সে কৃষকগণ শাখাবাঁকী ও জেলেখালীর ন্যায় বিরাট বিরাট দুটি বাঁধ দিয়ে শুধু সংঘটিত ও সংঘবদ্ধই হয়নি, ভিন্ন জায়-গার কৃষকদেরকেও আপনার বলে ভাবতে শিখিয়েছে এবং প্রয়োজনে তাদের সাহায্যে ঝাপিয়ে পড়তে আরম্ভ করে। কৃষকদের এতদিনের শ্লোগান ছিল "লাঙ্গল যার, জমি তার"। এবার তারা তার সাথে যোগ করছে- "দুনিয়ার মজদুর" এক হও"। তাদের আদর্শ কর্মে অনুপ্রানিত হয়ে ডুমুরিয়া থেকে দাকোপ পর্যন্ত গড়ে উঠেছে অসংখ্য কৃষক সংগঠন। তারাও নিজেদের উদ্যোগে বাঁধ দেয়। কেবল চাপান দেবার দিন (সমাপ্তির দুর্যোগময় মুহুর্তে) বিভিন্ন স্থানে সংবাদ দিয়ে হাজারে হাজার কৃষক কর্মীকে শরীক করে। তবে ঐ সময় তারা যেখানেই বাঁধ দিকনা কেন, তাদের বিশ্বাস—আত্ম প্রত্যয়ও বলা যায়—যে, বিষ্ণুদা যে বাঁধে পা দেবেন, সে বাঁধ কস্মিনকালেও ভাংবেনা। তাই সকল স্থান থেকেই তাঁকে নেবার চেষ্টা চলতো। বিষ্ণুদাও সাধ্য মত তাদের আবদার রক্ষা করতেন।

স্থানীয় কৃষকরা যে তাঁকে ঠাকুর বলে জানতো তাতো পূর্বেই বলা হয়েছে। সে সময় তার জনপ্রিয়তা এমনই তুংগে ওঠে যে, তিনি নৌকা যোগে কোন নদী বা খাল দিয়ে যাবেন জানতে পারলে সে নদী বা খালের দু'ধারে হাজার হাজার ছেলে-মেয়ে, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে দাঁড়িয়ে থাকতো। উদ্দেশ্য—ঠাকুরকে একনজর দেখে ধন্য হওয়া। তারা তাঁকে দেবশক্তির অধিকারী বলে মনে করতো। তিনিও অপেক্ষমান প্রতিটি লোকের অভিবাদন স্মিত হাস্যে গ্রহণ করতেন। সম্ভব হলে তাদের কুশল বার্তাও জেনে নিতেন।

আর এসব কারণে তখন তাঁর নামে বহু কিংবদন্তি ছড়িয়ে পড়ে। এখানে তাঁর সে সম্মোহনী শক্তির দু'তিনটি ঘটনার উল্লেখ করি।

বাঁধ বাঁধা প্রসংগ তুলে মাঝ পথে তার সম্মোহনী শক্তির কথা বলায় বিচক্ষণ পাঠক স্বাভাবতই এ প্রসাংগন্তরের জন্য আমার প্রতি না খোশ হবেন জানি। তবে বিনয়ের সাথে বলবো মার্কসীয় তত্বের আলোকে এদেশীয় কৃষকের সমস্যাবলীর সমাধান তৎকালীন ভারত বা বর্তমান বাংলায় অপর কাহাকেও এমন নিখুঁত ভাবে করতে দেখিনি। আর সে কারণেই এমহান নেতার কর্মকাণ্ডের কোন দিক রেখে কোন দিক নিয়ে যে আলোচনা করবো— তা নির্ণয় করাই কঠিন। তার সাথে সাথে এও বলে রাখি যে, বিষ্ণুদা এ সময় একই সাথে তিন পর্যায়ে কাজ করেছেন : (১) বাঁধ বন্ধি করা. (২) বাঁধের আওতাধীন জমিদারের খাস করা জমি পূর্বের কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করা এবং (৩) উক্ত বঁণ্টনকৃত জমির ধান কৃষকদের খামারে তোলার নিশ্চয়তা বিধান করা। আর এই একই সাথে একাধিক কাজ করায় সে কাজের বর্ণনা দেয়া কালেও প্রসংগান্তরের ঝোক এসে যায়।।

যাক যাই বলছিলাম. জমিদারগণ যখন বিষ্ণুদা ও তার কৃষক সমিতির সাথে কোন মতেই পেরে উঠছিলেন না. তখন তারা বিষ্ণুদাকে খুন করার জন্য একজন খুনীকে নিয়োগ করে। লক্ষণীয় যে, সে সময় প্রতি রাতে বিভিন্ন বাড়ীতে একাধিক বৈঠকসভা বসতো। সে খুনী মোক্ষম সুযোগের সন্ধানে পর পর দু'তিন রাতে সে সব বৈঠকীসভার পশ্চাত ভাগে ওঁৎ পেতে বসে থাকে। তা দেখে বিষ্ণুদার পক্ষের কেউ কেউ কয়েকবার বিষ্ণুদাকে সতর্ক করেও দিয়েছিল। কিন্তু বিষ্ণুদা তাতে তেমন আমল দেননি। এদিকে সে ওঁৎ পাতা খুনী পর পর কয়েকটি বৈঠকী সভায় বিষ্ণুদার আলোচনা শুনে নিজেই এমন সম্মোহিত হয়ে পড়ে যে, তৃতীয় রাতের সভার পরের দিন প্রভাতে বিষ্ণুদা

যখন গ্রামাঞ্চলে যাত্রা করবেন তখন সে পথের মাঝখানে এসে বিষ্ণুদার পা জড়িয়ে ধরে বলে যে, বৈঠকী সভায় সে বিষ্ণুদার কথা যতই শুনেছে ততই তার চেতনা হয়েছে যে, সে কি করতে যাচ্ছে! সামান্য টাকার লোভে একজন দেবতুল্য মানুষকে সে খুন করবে? সে মনের-যাতনা আর সহ্য করতে পারছিলনা। তাই এসে সব ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দেয়। আর লুকায়িত ছোরাটি বিষ্ণুদার গায়ের পরে রেখে বলে, "আপনি হুকুম করেন, আজই আমি জমিদারকে খুন করে আসি। তাতে আমার যদি ফাঁসিও হয় তবুও আমার অতীত পাপের কিছুটা লাঘব হবে"।

বিষ্ণুদা তখন তাকে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন: তোমার যে অনুশোচনা হয়েছে সেটাই আমাদের মস্ত লাভ। আমরা কাউকে খুন করতে বলিনে। (এ বক্তব্য থেকে এটাও পরিস্কার হয়ে যায় যে, বিষ্ণুদা পরবর্তী নকশাল আন্দোলনেও বিশ্বাসী ছিলেন না—লেখক)। কোন ব্যক্তিকে খুন করায় আমারা বিশ্বাস করিনে। আমরা চাই জমিদার—জোদদারের শোষণ ব্যবস্থা ধ্বংস করতে। ★

প্রমথ ভৌমিকের নিবন্ধ থেকে জানা যায় যে, পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ আইন বিরোধী আন্দোলনের জন্য বিষ্ণুদা ১৯৩৯ সালে আলিপুর জেলে যখন জেল খাটছিলেন তখন মাঝবয়সী একজন দরিদ্র মুসলমান চুরির দায়ে নাকি ঐ জেলে গিয়েছিল। সে তখন বিষ্ণুদার সংস্পর্শে এলে তার চরিত্রের পরিবর্তন ঘটে। সে বিষ্ণুদার পা ছুয়ে প্রতিজ্ঞা করে যে, সে আর চুরি করবেনা। জেল থেকে মুক্তি পাবার পর তার পূর্ব সংগী—সাথীরা তাকে যখন আবার চুরি করতে পিড়া-পিড়ি করে তখন সে না খেয়ে থেকেও আর চুরি করতে যায়নি।

☆ প্রমথ ভৌমিকের 'এক অনন্য সাধারণ কৃষক নেতা' শীর্ষক নিবন্ধ: : অমর কৃষক নেতা বিষ্ণু চট্টোপাধ্যায়।

খুলনার তৎকালীন তাত্বিক গুরু পূর্বক্ত প্রমথ ভৌমিকের লেখায় আরও জানা যায় যে, জমিদারদের পক্ষ হয়ে কৃষকদের ধান লুটের (জমিদার কৃষকদের ধান লুট করবে সুহৃদ পাঠকের কাছে এ কেমন অবিশ্বাস্য ঠেকছে ?—এর বিশদ বিবরণে পরে আসছি) জন্য জৈনিক মুসলিম লাঠিয়ালকে (সম্ভবতঃ তার নাম কোমল সরদার) এক মোচা টাকা বায়না দেয়। পরবর্তীতে কৃষক সমিতি ও বিষ্ণুদার প্রভাবে পড়ে সে জমিদারের কাচারীতে গিয়ে ঐ টাকার মোচা নায়েবের মুখের পরে ছুড়ে মারে।

প্রাসংগীক আর একটি উদাহরণ দেই। প্রমথ ভৌমিক বাবু একবার কয়েকজন সংগী—সাথী সহ রাতে নৌকা যোগে কোথায় যেন যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে ডাকাতের একটি ছিপ নৌকা ভৌমিক বাবুদের নৌকার কাছে এসে ভিড়ে পড়ে। অতঃপর ডাকাতরা যখন জানলো যে, সে নৌকায় বিষ্ণু ঠাকুরের লোক (বিষ্ণুদাও নন, তার লোক মাত্র) যাচ্ছেন তাতেই ডাকাতরা আপছে দূরে সরে যায়। ☆

জলেখালীর পরবর্তী বাঁধ সমূহ

যাক, সে সব কথা। বাঁন্ধ বন্ধি প্রসংগে পুনরায় ফিরে যাওয়া যাক।

১৯৪৩ সালে খরনিয়া ইউনিয়নের পাচুড়িয়া নদীতে বাঁধ দেওয়া হবে। আর সে বাঁধে পাঁচ হাজার বিঘা জমি আবাদ হবে। সে পাচুড়িয়া নদীটি প্রস্থে ছিল সোয়াশ'—দেড়শ' হাত, আর তার গভীরতা ১০/১২ হাত। কৃষকদের বিশ্বাস, বিষ্ণুদা যে বাঁধে পা দেবেন সে বাঁধ

☆ প্রমথ ভৌমিকের "এক অনন্য সাধারণ কৃষক নেতা" শীর্ষক নিবন্ধঃ অমর কৃষক নেতা বিষ্ণু চট্টোপাধ্যায়।

কস্মিন কালেও ভাংবেনা। আর তাই তারা তার স্মরণাপন্ন হয়—যদিও সে সব বাঁধ-বাঁধতে কোন দিক থেকেই সামান্যতম বাধাও আসেনি। জেলেখালীর পরবর্তী বাঁধ বাঁধতে আর কোন বাধাই আসেনি। তাই সে অঞ্চলের পরবর্তী বাঁধগুলির কেবল নামোল্লেখ করেই প্রসংগের সমাপ্তি টানছি।

১৯৪৪ সালে সাহস ইউনিয়নের রামাখালী ও কেয়াখালী দুই নদীতে দু'টি বাঁধ দেয়া হয়। তাতে ২০,০০০ বিঘা জমির একটি ঘের বেরিয়ে আসে। তথায় প্রথম দিকে স্থানীয় কৃষকগণ কাজ আরম্ভ করে। শেষ পর্যায়ে অর্থাৎ চাপানের দিন ও তার পূর্ব দিন বৈটা-ঘাটা, ডুমুরিয়া, মৌভোগ প্রভৃতি অঞ্চলের দশ হাজার কৃষক এসে ঐ কাজে শরীক হয়। ঐ সব বাঁন্ধ বান্ধিতে বিষ্ণুদার প্রত্যক্ষ শরীক থাকার প্রয়োজনও হয়নি। তখন স্থানীয় কৃষকগণও আঞ্চলিকতার ধ্যান ধারণার উর্ধে ওঠে "কৃষক মাত্রই ভাই ভাই" এ সত্য উপলব্ধি করতে আরম্ভ করে।

১৯৪৫ সালে সিংগিয়ায় দু'হাজার বিঘা জমির এক ঘেরে বাঁধ দেয়া হয়।

উল্লেখ্য করা প্রয়োজন যে, ডুমুরিয়া বাঁধে আশাতীত সফলতা দেখে তখন বটিয়াঘাটা থেকে দাকোপ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বিভিন্ন কৃষক সমিতির উদ্যোগে এত অসংখ্য বাঁধ গড়ে উঠে যে, প্রত্যেকটি বাঁধের নামোল্লেখও এক দুরুহ ব্যাপার। দাকোপ অঞ্চলে তখন যে মহান নেতা নেতৃত্ব দিয়েছেন তার নাম বাবু কুমার মিত্র। আলোচ্য গ্রন্থের শিরোনাম থেকে দাকোপ বিচ্ছিন্ন বিধায় সে প্রসংগ টানা অসংগত। অতএব এই বলেই শেষ করি যে, যে সরকার এতদিন বাঁন্ধ-বন্ধিতে বাধা দিয়ে আসছিল তারই উত্তরসুরী পাক সরকার তার অপরিহার্যতা উপলব্ধি করে ১৯৫২ সাল থেকে টেষ্ট রিলিফের মাধ্যমে

বাঁধ দিতে আরম্ভ করে। পরবর্তী আইয়ুব আমলে ১৯৬২/৬৩ সালে ওয়াপদা হয়ে বিরাট বিরাট বেড়ি-বাঁধ হয়েছে।

এখানে সচেতন পাঠকের সভাবতই প্রশ্ন জাগতে পারে যে, সরকারী খরচায় ওয়াপদার শত শত মাইল ব্যাপী যে বিরাট-বিশাল বাঁধ হয়েছে, তাকে তত গুরুত্ব না দিয়ে একে এত প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে কেন? তবে কি, ডুমুরিয়ার কৃষক সমিতি বাস্তবতা উপলব্ধি করে প্রথমে যখন বাঁধ দিতে আরম্ভ করে, নির্বোধ সরকার তখন তাতেতো সহযোগিতা করেইনি উপরন্তু প্রতিবন্ধকতা করেছে বলেই কি এটা এত প্রধান্য পাচ্ছে?

স্মরণ করান যেতে পারে যে, দৈহিক দিক দিয়ে স্থুল হলেই যেমন শারিরীক সুস্থতা বুঝায়না তেমনি আকারে বিরাট হলেই মহৎ হয়না। গুণগত বৈশিষ্ট্যই বস্তুকে মহৎ করে। ডুমুরিয়ার কৃষকগণ নিজেদের প্রয়োজন মত উচু জায়গায় উচু বাঁধ আর নিচু জায়গায় নিচু বাঁধ দিয়েছে। তাতে নিচু জমি উচু হবার অবকাশ ছিল না। কিন্তু ওয়াপদার কর্ম-কাণ্ডে কৃষকদের ইচ্ছে-অনিচ্ছের তোয়াক্কা না করে নিচু জমিতে বিরাট বাঁধ দেয়ায় নিচু জমি উচু হয়ে অনুর্বর হয়ে পড়েছে। তাছাড়া কৃষকগণ তখন যে বাঁধ দিতো তাতে বিভিন্ন খাল-বিল দিয়ে সে অঞ্চলে জল প্রবাহের পথ উন্মোক্ত থাকতো বলে জমিতে পলি পড়ে উর্বর থাকতো। পক্ষান্তরে ওয়াপদার ঐ বিরাট বাঁধে খাল-বিল নালা সব একাকার করে দেয়ায় জমি ক্রমান্বয়েই হয়ে পড়েছে অনুর্বর। নাম সর্বস্ব যে কয়টি স্লুইজ গেট আছে তার অধিকাংশই হয় অকেজো, নয়তো বিকল।

মোট কথা, পূর্বে ডুমুরিয়ায় লোনা জল প্রবেশ করায় তথাকার জমিতে যেরূপ ফসল ফলতোনা বা ফললেও তা বিনষ্ট হতো অধুনা ওয়াপদার ঘেরে নিয়মিত জল সিঞ্চন ও নিষ্কাশন না হওয়ায় এবং তার

সাথে সাথে পর্যাপ্ত প্রয়োজনীয় সার সরবরাহের অভাবে বহু জমিই ডুমুরিয়ার সে পূর্বাবস্থায় ফিরে যাচ্ছে। এসব কারণেই ডুমুরিয়ার কৃষক সমিতির ঐ কর্মকাণ্ড ন্যায়তই প্রধান্য পাবার অধিকারী। ডুমুরিয়ার আন্দোলন পূর্ব আমল আর বর্তমানে তার কৃষিজাত ফসলের উৎকর্ষতা ও প্রাচুর্যতাই কৃষক সমিতির কৃতকর্মের স্বার্থকতা প্রমাণ করে—তার জন্য ভিন্ন ভাবে প্রচার বা প্রপাগাণ্ডার প্রয়োজন হয়না। ১৯৪০/৪১ সালের ডুমুরিয়ার বাঁধ-বন্ধির আওতাধীন জমিতে উৎপাদিত ফসলে খুলনা ও যশোর—এ দু'টি জেলায় আজও বাজার জাত হয়ে পূর্বোল্লিখিত পণ্য সম্ভারে সমৃদ্ধ দেখার পরও কি ডুমুরিয়ার ঐ আন্দোলনের যথার্থতা প্রমাণের আর অবকাশ রাখে ?

বিষ্ণু ঠাকুরের আইন : জমিদারের ধান চুরি

আলোচ্য সময় কৃষক সমিতির উদ্যোগে বিভিন্ন বাঁধ দেয়ায় ডুমুরিয়া থেকে ডাকোপ পর্যন্ত জমিতে যে সোনা ফলতে আরম্ভ করে তা আর বিশদ ভাবে বলার অপেক্ষা রাখেনা। যে সব জমিদার এতদিন ঐ বাঁধ-বন্ধিতে প্রতিবন্ধকতা করে আসছিলেন তারাই পরবর্তীতে রাতের আঁধারে সে সোনার ফসল চুরি করতে আরম্ভ করেন।

এদিকে জমিদারগণ ইতিপূর্বে যে হাজার হাজার বিঘা জমি কাগজে-কলমে খাস করে নিয়েছিলেন, কৃষক সমিতির সহায়তায় পূর্বের সে কৃষকগণ প্রকাশ্য দিবালোকে সে সব জমির ধান কেটে নিজ নিজ খামারে তুলতে থাকে। সে সময় (১৯৪৬ সালে) সারা জেলায় কৃষকদের মুখে মুখে প্রচার হয় যে, বিষ্ণু ঠাকুরের আইন : "কৃষক তার খামারে ধান তুলবে, আর মালিক সেখান থেকে তিন ভাগের এক ভাগ বুঝে নেবে"।

এদিকে কাগুজে মালিক-জমিদারগণ উপায়ান্তর না দেখে ভাড়াটে

লাঠিয়ালদের সাহায্যে সুযোগ মত রাতের আঁধারে সে ধান চুরি করতে থাকে। এভাবে এতদিন যে জমিদারগণ জমির মালিক ছিলেন এবার থেকে তারাই চোরে পরিনত হন। আর কৃষক-সাধারণ রাতভর সে ধান চোর তাড়িয়ে বেড়ায়। কৃষক জনতার ঐক্য জোটের সে এক বাস্তব পরিনতি।

প্রথম একবার এক খণ্ড জমি নিয়ে বিবাদ বাধে। তা ছিল এক-জন প্রজা উচ্ছেদের ব্যাপার। সমিতি সংঘবদ্ধভাবে জমিদারের লাঠিয়াল ও বরকন্দাজদের তাতে বাধা দেয়। ফল হয় উভয়দিক থেকেই অপ্রত্যাসিত। জমিদারে লোক পিছু হটতে বাধ্য হয়। তাতে জমিদারের ভ্রম ভাঙ্গে। এই প্রথমবার তারা দেখলেন যে, তাদের এতদিনের কল্পিত ভীরু-ভীতু কৃষকগণও সমিতির পতাকা তলে সমবেত হতে পারে। আরও দেখলেন যে, তারা সংঘবদ্ধ হলে জমিদারের লাঠিয়ালদেরকেও হটাতে পারে। সে থেকেও কৃষকদের বিশ্বাস জন্মে যে, তারা একতাবদ্ধ হয়ে রুখে দাঁড়ালে জমিদারের বলদর্পী বরকন্দারাও লেজ গুটায়ে পালাতে বাধ্য হয়। তারপর থেকে কৃষকদের মধ্যে আসে আরও অধিক ঐক্য—চেতনা ও সংঘবদ্ধ হবার অনুপ্রেরণা।

উপরোক্ত ঘটনার পর একরাতে কৃষক সমিতির জনৈক গুপ্তদুত মারফত খবর পাওয়া গেল যে, পাতিবুনিয়ার ফেরাজতুল্লার ধান জমিদার অক্ষয় ভট্টাচার্যের ★ লোকেরা সে রাতের আঁধারে কাটবে। আরও খবর পাওয়া গেলো যে, তাদের সাথে নাকি বাছা বাছা লাঠিয়ালও আসবে আর তাদের সাথে থাকবে দু'একটা বন্দুক।

সেই সল্প সময়ের মধ্যে নিজেদের পক্ষের লাঠিয়াল সংগ্রহ করাতো সম্ভবই নয়, এমন কি পার্শ্ববর্তী সকল স্থানের সক্রীয় কর্মীদেরকে

☆ শিরিশ ভট্টচার্জী ও অক্ষয় ভট্টচার্জী পরস্পর সহোদর ভাই। আর শিরিশ ভট্টচার্জীর তনয় হলেন ধীরেন ভট্টচার্জী।

একত্রিত করাও সম্ভব নয়। অগত্যা বিষ্ণুদা অনেকটা অসংগঠিত ভাবেই কিছু কর্মী নিয়ে তাদের মোকাবেলার প্রস্তুতি নেন।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সংশ্লিষ্ট জমিটিও জমিদার খাস করে নিয়েছিলেন। কিন্তু পূর্ব মালিক ফেরাজতুল্লা কৃষক সমিতির সহায়তায় এমন ভাবে সে জমি ভোগ করে আসছিলেন যে, সে খাসের যেন কোন মূল্যই নেই; তিনিই জমির প্রকৃত মালিক।

কখন উক্ত চোরের দল এসে পড়ে এ ভেবে ভেবে আগন্তুক কর্মীরা একসময় ঘুমিয়ে পড়ে। রাত দুপুর পেরিয়ে যায় তখনও চোরের দল আসেনি। শেষ রাতে বিষ্ণুদার যখন একটু তন্দ্রার মত আসে তখন হঠ্যাৎ করে চতুর্দিক থেকে মুহুর্মূহু কাঁসর ঘন্টা আর সিংগার ফু আসতে থাকে। সাথে সাথে শত শত, দেখতে দেখতে হাজারে হাজার কৃষক ভলন্টিয়ার লাঠি, দা, সড়কি, হাতের কাছে যে যা পেয়েছে তা-নিয়ে ঊর্ধশ্বাসে ছুটতে ছুটতে মাঠে এসে জড়ো হয়।

বলা বাহুল্য যে, ভাড়াটে সশস্ত্র-সংঘবদ্ধ লাঠিয়াল দল আর তার সাথে সাথে নৌকার ছৈ-এ বন্দুক তাক করা নরখাদক নায়েব মহাশয়কে প্রথম দৃষ্টিতে দেখে কাসর ও সিংগাওয়ালারা এমন ভাবে হতভম্ভ হয়ে পড়ে যে, তাদের হাতের কাসর পিটাতে ও সিংগা ফুকাতে ইতিমধ্যেই বেশ বিলম্ব করে ফেলছে। সে সুযোগে সংঘবদ্ধ লাঠিয়াল দল ঝটাপট ধান কেটে সাত-আট নৌকা বোঝাই করে ফেলে। সে পরিস্থিতিতে বিষ্ণুদাও হকচকিয়ে পড়েন। কারণ তার সাথেতো লাঠিয়াল ছিলইনা, তদুপরি যে ক'হাজার কৃষক ছিল তারাও ছিল অসংগঠিত। তাদের পরিচালনা করার মত তেমন কোন দক্ষ নেতাও সেখানে ছিলেন না। তাই তারা তখন পরস্পর পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করছিল। আর অধিকাংশই তদদণ্ডে করণীয় হুকুমের আশায় বিষ্ণুদার পানে তাকিয়ে ছিল।

এদিকে জমিদারের লাঠিয়াল দল সেই বিপুল কৃষক বাহিনী দেখে

"বিষ্ণু ঠাকুরের দল আসছে, পালা - পালা"— বলতে বলতে ধান বোঝাই নৌকা নিয়ে শাখাবাকী নদী দিয়ে দ্রুত প্রস্থান করে। পক্ষান্তরে কৃষক পক্ষ তখন কিংকর্তব্য বিমূড়। ঠিক সে মুহূর্তে এগিয়ে এলেন এক বৃদ্ধ— নাম তার অভয় চরণ সরদার। লোকে তাকে "মাল" বলেই জানে। তিনি সকলকে কুৎসিৎ ভাষায় গাল পেড়ে বললেন ঃ

"কুত্তার বাচ্চারা, ধান নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে চোরেরা, আর তোরা দাঁড়ায়ে দাঁড়ায়ে কি দেখছিস ? ছোট্ ব্যাটারা ছোট্। ঐ শালা ধান চোরদের কান ধরে টেনে নিয়ে আয়"—বলে বয়বৃদ্ধ সরদার লাঠি নিয়ে সবার আগে আগে ছুটলেন। পেছনে রইল অগনিত কৃষক-জনতা।

একেই বলে নেতৃত্ব (অভয় চরণ সরদারের অপরাপর কীর্তির কথায় পরে আসছি)। তাঁর কথায় কি যাদু ছিল কে জানে ? লোকজন তখন হা হুতাশ আর পরস্পরের প্রতি দোষারোপ ত্যাগ করে উর্ধশ্বাসে তাঁর পেছন পেছন ছুটছে। এদিকে তাদের ছুটতে দেখে নৌকার লোকজনও দ্বিগুণ বেগে নৌকা বেয়ে চলছে। কিন্তু যত বেগেই নৌকা চলুকনা কেন দৌড়ের পাল্লায় পারবে কেন ? দৌড়ে আর একটু এগুলেই যে নৌকাগুলি ধরা পড়বেই।

কিন্তু হায়, সব হরিষে বিষাদ ! এত দৌড়া-দৌড়ির পর দেখা গেল যে, নৌকাগুলি এমন জায়গায় গিয়ে পড়েছে যে, তার থেকে আর একটু এগুলেই তারা (জমিদারের পাইক বরকন্দাজরা) অনায়াসে ভদ্রা নদীতে গিয়ে পড়বে। তখন তাদেরকে আর একত্রে এরূপ বেড় দেয়া সম্ভব হবে না। বিস্তীর্ণ ভদ্রা নদীতে তারা তখন নাগালের বাইরে চলে যাবে। হায় ! হায় ! এত চেষ্টাই যে বৃথা যেতে বসছে !

না, কোন চেষ্টাই বৃথা যায়না। তাদের চেষ্টাও বৃথা গেলোনা। পুনরায় ক্ষীণ আশার সঞ্চার হলো। জমিদার পক্ষের নৌকার গতি হঠাৎ কেমন যেন মন্থর হয়ে এলো। সন্মুখপানে এগুতে তারা যেন কেমন

ভয় পাচ্ছে। পরক্ষণেই দেখা গেলো, গোটা দশেক ছিপ নৌকা পাশের খাল দিয়ে বেড়িয়ে এসে ধান চোরদের নৌকার পথ বন্ধ করে দাঁড়িয়েছে। কিছুক্ষণ পর তার কারণটাও স্পষ্ট হয়ে গেল।

সমিতির লোকজন সোল্লাশে চেঁচিয়ে উঠে: "ঐ যে সোনা, হাত নেড়ে আমাদের ইশারা দিচ্ছে।" তখন ব্যাপারটা আরও পরিস্কার হয়ে গেল।

ধানিবুনিয়ার হীরালাল বাইনের দল কৃষক সমিতিকে সাহায্য করতে এসেছে। এ হীরালাল বাইন এযাবৎ জমিদার অক্ষয় ভট্টচার্যের প্রধান লাঠিয়াল ছিলেন। আজ হঠাৎ এমনি ভাবে তিনি জমিদারের নৌকা ঘেরাও করার কারণটা এখানে ব্যক্ত করা প্রয়োজন।

যে রাতে বিষ্ণুদা সমিতির গুপ্তদূত মারফত জানলেন যে; ফেরাজতুল্লার ধান চুরি হবে, সে রাতের স্বল্প সময়ের মধ্যে চতুর্দিকের লাঠিয়াল সংগ্রহ করার মত সময়ও যখন তাঁর ছিলনা তখন তিনি কৃষক সমিতির কর্মী সোনাকে দিয়ে হীরালাল বাইনের কাছে একখানা চিঠি পাঠালেন। এ সোনাই ইতিপূর্বে রিপোর্ট করেছে যে. তাদের লোক ধানিবুনিয়া গেলে হীরালাল বাইনের লোকেরা নাকি তাদের বেশ শিষ্টাচার দেখিয়েছে। বিষ্ণুদা তখন বাইন বাবুকে লিখেছিলেন :

"আপনি কৃষক সন্তান, নিরপরাধ কৃষকের রক্তপাত করে কেন আপনার ন্যায় দক্ষ লাঠিয়াল হাত কালো করবেন? আমরা আপনাকে চাষের জন্য প্রয়োজনীয় জমি দেবো। কৃষকদের বিরুদ্ধে আপনি লাঠি ধরা বন্ধ করুন।" ★

বিষ্ণুদার উপরোক্ত আবেদনে পাষাণ লাঠিয়ালের হৃদয়ও গলে গেল। আর তাই তিনি ঐ ভাবে এসে জমিদারের নৌকাগুলি ঘেরাও করে ফেললেন। সে অঞ্চলের সর্ব শ্রেষ্ঠ লাঠিয়ালকে যিনি একটি মাত্র চিঠিতে

★ সত্যেন সেন: গ্রাম বাংলার পথে পথে।

এভাবে সম্মোহিত করেছেন—নিঃসন্দেহে তিনি ক্ষনজন্মা যুগ-যুগান্ত পরই এমন একজন ক্ষণজন্মার আবির্ভাব হয়।

যাক, যা বলছিলাম। ধান চোরেরা ঐ অবস্থায় কৃষক সমিতির হাতে গ্রেফতার হয়। কুখ্যাত নায়েব কালি কিংকর বিষ্ণুদার পায়ের পরে বন্দুক রেখে প্রাণ ভিক্ষা করে। বিষ্ণুদা অভয় দিয়ে এবং অনেক বলে কয়ে তার বন্দুক তাকে ফিরিয়ে দেন। তারপর ধানিবুনিয়া দলের সরদার হীরালাল বাইন মহাশয় বিষ্ণুদার সাথে দেখা করতে আসেন। কি শান্ত-সুন্দর আর কমনীয় চেহারা! দেখে অবাক হয়ে গেলেন বিষ্ণুদা। এত দুরধর্ষ লাঠিয়াল, আর এই তার চেহারা! তিনি দু'হাত বাড়িয়ে হীরালাল বাবুকে জড়িয়ে ধরে বললেন:

"আমাদের বিপদের সময় আপনারা যেভাবে সাহায্য করেছেন সে কথা কোনদিন ভুলতে পারবোনা। কৃষক সমিতির পক্ষ থেকে আপনাদের ধন্যবাদ দিচ্ছি।"

বিষ্ণুদার কথা শুনে বাইন মহাশয় লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে বললেন:

"ছি, ছি, এ কি সব বলছেন! আমরা কৃষক সন্তান। আমাদের কৃষক ভাইদের জন্য যেটুকু পেরেছি তাই করেছি। এতে ধন্যবাদের কি আছে? ★

উপরোক্ত ঘটনার পর থেকে জীবনের শেষ দিন (৫ই অগ্রহায়ণ ১৯৮২ খৃষ্টাব্দ) পর্যন্ত হীরালাল বাবু তার এলাকায় আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন। ধানিবুনিয়া আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে বাবু সুধীর চ্যাটার্জী নেতৃত্বে এলেও হীরালাল বাইন মহাশয়ই শেষ পর্যন্ত সে আন্দোলন চালিয়ে নিয়েছেন। এবার সে সংগ্রামের বিবরণ দিই।

★ সত্যেন সেন: গ্রাম বাংলার পথে পথে।

ধানিবুনিয়ার সংগ্রাম

১৯৪৮ সালে ৩৪৭/৩৪৮ ধারায় বকুল তলার কিছু আসামী (পুলিশের ভাষায় দুস্কৃতকারী) খোঁজার উদ্দেশ্যে চৈত্র মাসের মাঝামাঝি সময় ১০/১৫ জন পুলিশ ৫/৬টি রাইফেল নিয়ে বোটে চড়ে ধানিবুনিয়ার তথাকথিত স্বাধীন এলাকায় অবতরণ করে (সে সময় বিষ্ণুদা ছিলেন জেলে, আর নকুল মল্লিক ছিলেন ধানিবুনিয়ায়)। পুলিশ তীরে নেমেই গ্রামটা ঘিরে ফেলে। অতঃপর চলে অকথ্য অত্যাচার। তারপর তারা যখন ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানতে আরম্ভ করে তখন কৃষকরা আর নীরবে মার খেলোনা। ছেলে-মেয়ে, যুবা-বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সম্মিলিত ভাবে পাল্টা আঘাত হানে। আর তার পরই চলে পুলিশী গুলি। সে গুলিতে ঘটনা স্থলেই প্রাণ দিলেন হীরালাল বাইনের পুত্র রমাকান্ত বাইন, তার সহোদর সতীশ বাইন ও অপর এক কর্মী—মাদার মণ্ডল। বাটুল গুলিতে গুরুতরভাবে আহত হন।

পুত্রের মৃত্যুতে হীরালাল বাইন কি বলেছিলেন জানেন? বলেছিলেন: "ওরা একপুত্র মরেছে, সে জন্য হীরালাল বাইন দমে যাবে না। এক পুত্র গেছে, আরও পুত্র আছে। আর আমার সব পুত্রও যদি যায়, দেশের লক্ষ লক্ষ কৃষক সন্তান থাকবে। তাদের সবাইকে ওরা মারতে পারবেনা।" ✫

এহেন মহাপ্রাণ ব্যক্তিকে দিয়াও পূর্বাকালীন অজ্ঞতার সুযোগে কুখ্যাত জমিদারগণ পূর্বোল্লিখিত ভাবে এদেশের কৃষক সন্তানদেরকে হত্যা করিয়েছে। পরশ্রমজীবীদের অনুরূপ ভ্রাতৃ হনন প্রবনতা আজও বিদ্যমান আছে

✫ সত্যেন সেন: গ্রাম বাংলার পথে পথে।

—এ সত্যটি শ্রমিক-কৃষকদেরকে অবশ্যই অনুধাবন করতে হবে।

পুলিশের গুলিতে রমাকান্ত বাইন, সতীশ বাইন ও মাদার মণ্ডলের মৃত্যুর পর কৃষক ও লাঠিয়াল বাহিনী পুলিশদেরকে পাঁচ মাইল পথ তাড়িয়ে নিয়ে যায়। ভাগ্যক্রমে সেখানে একটি খালি নৌকা পেয়ে নদীপার হয়ে পুলিশেরা সে যাত্রায় প্রাণে বেঁচে যায়।

উক্ত ঘটনার মধ্যদিয়ে পাক-ভারত-বাংলাদেশে কৃষক আন্দোলনে সৃষ্টি হয় এক অবিস্মরণীয় ঐতিহাসিক অধ্যায়, আর সে অধ্যায়ের বীর নায়ক হীরালাল বাইনকে জানাই অকুণ্ঠ প্রণতি।

উপরোক্ত পুলিশ পলায়নের পর ঐ চৈত্র মাসেরই শেষ দিকে ৪/৫টি লঞ্চ যোগে ১৫০/২০০ পাঞ্জাবী মিলিটারী একটি গান বোট নিয়ে পুনরায় ধানিবুনিয়ায় যায়। তারা সেখানে গিয়ে বহু ঘরবাড়ী ধ্বংস করে এবং বহু ধানের গোলা লুট করে ২/১ দিন পর চলে যায়। তার ২/১ সপ্তাহ পরে একশ' মেলেটারী এসে বান্দা হাই স্কুলে ক্যাম্প করে প্রায় এক বছর থেকে যায়। সে সময় তারা দালালদের মাধ্যমে অজস্র টাকা পয়সা আদায় করে। আর অপর দিকে হাঁস, মুরগী, খাসী নিয়ে খেয়ে জনগণকে সর্বশান্ত করে দেয়।

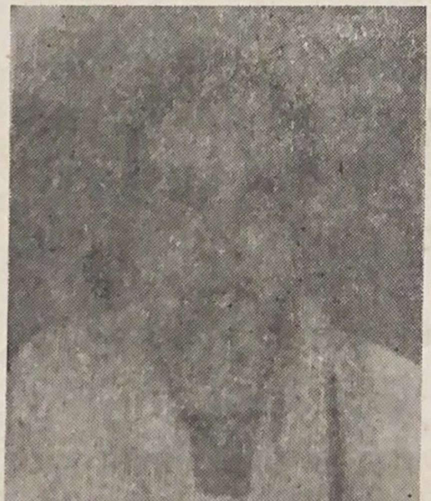

হীরালাল বাইন

উপরোক্ত বীর হীরালাল বাইন বৃদ্ধ বয়সে ১৯৮২ খৃষ্টাব্দের ৫ই অগ্রহায়ণ রবিবার বেলা ১১—৪৫ — এ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বকুলতলাম মামলার আসামীদের ধানিবুনিয়া ধরতে এসে পুলিশ এক লঙ্কাকাণ্ড ঘটায়ে যাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছিল, দীর্ঘ দিন সে মামলা চলায় পর সরকার পক্ষই সে মামলায় হেরে যায়।

পুলিশী উৎপাত

বলা বাহুল্য যে, বিষ্ণুদার শোভনা আগমণের পর ঐ অঞ্চলের কর্মকাণ্ড এত বহুল ও বিপুল হয়েছিল যে, বছর ওয়ারী এক নাগাড়ে বাঁধ বাঁধার কথা বললে খাস জমি দখলের কথা বাদ পড়ে। আবার খাস জমি দখলের কথা এক নাগাড়ে বললে উক্ত খাস জমির ধান কেটে কৃষকদের খামারে তোলার কথা বা তৎকালীন পুলিশী জুলুমের কীর্তি-কাহিনী বাদ পড়ে যায়। বক্তব্যের ঐ ধারাবাহিকতা বজায় রাখা আমার ন্যায় তুচ্ছলেখকেরপক্ষে শুধু দুঃসাধ্যই নয়— অসম্ভবও বটে। কারণ পূর্বেই বলা হয়েছে যে, তখন যুগপৎ তিন ধারায় কাজ চলেছে।

যাক, এবার পুলিশী উৎপাতের কিছু কীর্তি-কাহিনী আলোচনা করা যাক। বলা বাহুল্য যে, শোভনার কৃষক সমিতি সক্রীয় হওয়ায় পর অর্থাৎ ১৯৪৩ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত ডুমুরিয়ার পুলিশ পারত পক্ষে শোভনায় প্রবেশ করতোনা। বিরুদ্ধ পক্ষের কেউ কোন কেস দিতে গেলে পুলিশ তাদেরকে খুলনা গিয়ে দিতে বলতো। তবে ঐ পরিস্থিতিতেও পুলিশ অত্যন্ত সংগোপনে বিষ্ণুদাকে ধরার জন্য ওঁৎ পেতে থাকতো। সে ওঁৎ পাতার প্রধান প্রতিবন্ধকতা করতো শোভনা স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীগণ। পুলিশ আসছে শুনলেই ছাত্র-ছাত্রীগণ স্কুল ছেড়ে শ্লোগান দিতো—"পুলিশী জুলুম চলবেনা, চলবেনা, কৃষক সমিতি জিন্দাবাদ"—ইত্যাদি বলে।

উক্ত ছাত্র-ছাত্রী ছাড়াও বিদ্যাধরীদি'কে পুলিশ ভয় করতো যমের মত। কারণ তিনি পুরুষ না হয়েও হাজার পুরুষের তুল্য-মূল্য ছিলেন।

শোভনার কোথাও পুলিশ আসছে শুনলেই তিনি দা, খন্তা, খুন্তি, বটি, ঝাটা—যাই হাতের কাছে পেতেন, তাই নিয়ে পুলিশদেরকে তাড়া করতেন। কখনও একাই, আবার কখনওবা তাঁর সাথে থাকতেন যমুনাদি, তরংগ বালা, মালতীদি, প্রভাবতী, কিরণ বালা প্রমুখ। আবার কখনওবা একপাল কৃষককর্মী তাদের পিছু পিছু ছুটতো। তিনি ছিলেন বিধবা আর নিঃসন্তান। সম্ভবতঃ সে কারণেই তিনি সকল কৃষকদের জানতেন নিজ সন্তান সমতুল্য। আর সেই কারণেই কৃষক পরিত্রাণকারী বিষ্ণুদাকে রাখতেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টির অন্তরালে। এমন দেশ-প্রেমিক মহিয়সী-মহিলা প্রতি গৃহে জন্মায়না। যে দিন বাংলার প্রতিটি জেলায় অতন্তঃ একজনও জন্মাবেন সেদিন দেশের রূপ পাল্টাতে বাধ্য। বিদ্যাধরীদির হাতের অস্ত্র—দা, খন্তি, বটি, ঝাঁটা-দেখলে সশস্ত্র ব্যাক্তি লজ্জা-সরমেও প্রস্থান করতে বাধ্য হতো। হাতের ঐ অস্ত্র ছাড়াও অপর মারাত্মক অস্ত্র ছিল তার রনহুঙ্কার : পুলিশী জুলুম চলাবেনা, চলবেনা। লাঙ্গল যার, জমি তার"—ইত্যাদি, ইত্যাদি।

কৃষক সমিতির কর্ম তৎপরতা বৃদ্ধির সাথে সাথে পুলিশী তৎ-পরতাও উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। তবে সমিতির সংঘবদ্ধ-তার দরুণ পুলিশ প্রকাশ্যে কাজ করার সুযোগ পেতোনা। তাই তারা বিষ্ণুদাকে ধরার জন্য ফাঁকে ফাঁকে আচমকা আক্রমণ চালাতো। এবার সে প্রসংগে আশা যাক।

১৯৪২ সালে একবার শোভনা স্কুলে বিষ্ণুদা মিটিং করছিলেন। সে সময় হঠাৎ দূরে পুলিশের টিকি দেখা গেল। আর অমনি স্কুলের সমুদয় ছাত্র-ছাত্রী (সে সময় স্থানীয় রসিক লাল মল্লিকও সে স্কুলে ছিলেন। একথা তার কাছেই শুনা) বেরিয়ে এসে চিৎকার দিতে থাকে : "পুলিশ জুলুম চলবেনা, পুলিশ তুমি ফিরে যাও" —ইত্যাদি,

ইত্যাদি। সে ফাঁকে বিষ্ণুদা কেটে পড়েন। এদিকে ছাত্র-বিক্ষোভের মুখে পুলিশরাও কেটে পড়তে বাধ্য হয়।

ঐ সম সাময়িক কালে পুলিশ আর একবার লঞ্চ নিয়ে গোডাউন ঘাটে এসে ভিড়ে। বিদ্যাধরী দি তখন কৃষক-জনতা নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলে পুলিশরা সেবারও ফিরে যেতে বাধ্য হয়।

আর একবার সতীশ হালদার বাবুর বাড়ী মিটিং করার সময় পুলিশ আসে। সেবার সংগী-সাথীদের পরামর্শে তিনি বিষ্ণু হালদার বাড়ীর পেছনের বাঁশ বাগানের মধ্য দিয়ে ভদ্রা নদী পাড়ি দেন। থানকার (সামন্তসেনার) জমিদার-নন্দন বিষ্ণুদা সেবার সাঁতরে ভদ্রা নদীর মাঝখানে এসে ডুবে যাচ্ছিলেন। সে ডুবন্ত প্রায় অবস্থায় পার্টির জনৈক কর্মী দ্রুত নৌকা নিয়ে গিয়ে তাঁকে তুলে মনীন্দ্র সরকারের বাড়ী রেখে দেয়। পরম বিস্ময়ের ব্যাপার যে, সে ভদ্রা নদীতে তখন প্রচুর কুমীর ও কামট ছিল। আজও সে নদীতে কামট আছে। তাই তখন সে নদী সাঁতরে পাড়ি দেয়াই ছিল অবিশ্বাস্য। আর সে সব কারণেই অজ্ঞ ও ধর্মভীরু ভক্তবৃন্দ প্রচার করতে থাকে যে, বিষ্ণু ঠাকুর পায়ে হেটেই সে নদী পার হয়েছেন। তাদের অন্ধ বিশ্বাস ছিল যে, বিষ্ণু ঠাকুরকে পুলিশ কেন দুনিয়ার কোন্ শক্তিই ধরতে পারবেনা। তাদের মতে, তিনি ছিলেন অবতার।

আদতে উপরোক্ত ধারণাটা ছিল মারাত্মক ভ্রান্তিকর। অনুরূপ ব্যক্তিপূজা বা ব্যক্তি কেন্দ্রিকতা ছিল বিষ্ণুদার পার্টি আদর্শ বহির্ভূত। বিষ্ণুদাও ঐ ব্যক্তি পূজার কাঙ্গাল ছিলেন না। ব্রাহ্মণ সন্তানদের প্রতি হিন্দু সম্প্রদায়ের বিশেষ করে কৃষক-শ্রমিকের অনুরূপ মোহ বা বিশ্বাস যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। পার্টি স্বার্থেই পার্টি কর্মীদের সে মোহ-মুক্তি ঘটান উচিৎ ছিল। সে সময় সোনাডাঙ্গা (শশীভুষণ বিশ্বাস—পাগলদের বাড়ীর দক্ষিণ দিকের) মাঠে কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হতো।

সে প্রশিক্ষণ দিতেন মনমোহন চ্যাটার্জীর ভাই-ললিত চ্যাটার্জীর পুত্র বাবু সুধীর চ্যাটার্জী (বুধুদা')। মাঝে-মধ্যে আসতেন বিশিষ্ট তাত্ত্বিকগণ। সম্ভাবত: সেখানেও সে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার মোহ ঘুচাবার প্রচেষ্টা নেয়া হয়ে থাকবে। আর যদি তা না নেয়া হয়ে থাকে, তবে অবশ্যই নেয়া উচিৎ ছিল।

যাক, যা বলছিলাম—বিষ্ণুদা' নৌকায় চড়ে কোথাও গেলে তিনি শুয়ে মুখের সন্মুখে একখানা বই বা খবরের কাগজ তুলে পড়তেন। সে অবস্থায় পুলিশ তাকে অনেকবার দেখেও চিনতে পারেনি।

পুলিশ পাঁয়তারার কথা আপাতত: বাদ দিয়ে এবার তৃতীয় জেলা কৃষক সম্মেলনের কথায় আশা যাক। তবে তার আগে একটি মাত্র উদাহরণ দিই—যা দিয়ে বিচক্ষণ পাঠক বিলক্ষণ প্রমাণ পাবেন যে, দেশ প্রেমিকরা কৃষকদের জন্য কাজ করলে কৃষক গৃহণীগণও নিজ নিজ বুদ্ধি বিবেচনা দিয়ে তাদের আপদকালে কি নিপুন ভাবেইনা ছত্র-ছায়া দিয়ে থাকেন।

১৯৪৩/৪৪ খৃষ্টাব্দে বৈটাঘাটার কৃষক-কর্মী ও পার্টি সদস্য বাবু রামলাল বিশ্বাস কিছু দিন নিচ খামার (খুলনা রেডিও ষ্টেশনের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত) গ্রামের মংগল মণ্ডলের আশ্রয় ও আস্তানায় ছিলেন। এ খবর পেয়ে একদিন সকাল ৭/৮ টায় দু'জন পুলিশ ঐ মণ্ডলের বাড়ী চড়াও করে। মংগল মণ্ডলের বৃদ্ধা স্ত্রী তা টের পেয়ে পেছন দরজা দিয়ে রাম বাবুকে সরিয়ে দেন। এদিকে পুলিশ এসে বৃদ্ধাকে হুমকি ধুমকি মেরে রামলাল কোথায় তা পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাস করে। বৃদ্ধা পুলিশের হুমকি-ধমকিতে যেন ভেবা-চেকা খেয়েছেন এমন হাবা-গোবা ভাব করে নিজ ভ্রাতুষ্পুত্রকে দেখায়ে বললেন: "ঐ তো রামলাল, আমার ভাইর ছেলে"। পুলিশ তখন বৃদ্ধার ভ্রাতুষ্পুত্রকে ধরে প্রহার করতে আরম্ভ করে। পুলিশের এহেন আচরণে সে বাড়ীরই জনৈক

নটবর মণ্ডল ভয়ে তখন নিজ কোচার কাপড়ে মাথা মুড়ি দিয়ে দৌড়ে পালাতে থাকে। সে অবস্থায় স্থানীয় লোকজন দৌড়ান নটবর মণ্ডলের দিকে হাত তুলে চিৎকার করে বলে—"ঐ তো রামলাল পালাচ্ছে!" এ শুনে পুলিশ 'ফুলিস' বনে বৃদ্ধার ভ্রাতুষ্পুত্রকে ছেড়ে নটবর মণ্ডলের পেছন পেছন ধাওয়া করে। এদিকে ততক্ষণে রাম বাবু পার্শ্ববর্তী হোগলা বনের মধ্য দিয়ে বহুদূর চলে গেছেন।

বলা বাহুল্য যে, সে সময় রাম বাবু ধরা পড়লে তিনিই শুধু একা ধরা পড়তেন না, পকেটে রক্ষিত বস্তুটিও তাঁর সাথে সাথে ধরা পড়তো।

তৃতীয় জেলা ও পরবর্তী প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলন

এবার তৃতীয় জেলা ও তার পরবর্তীতে প্রাদেশিক সম্মেলন প্রসঙ্গে আসা যাক:

১৯৪৪ সালে মে মাসে সাহসে তৃতীয় জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সে সম্মেলনে ২৫,০০০ কৃষকের সমাবেশ ঘটে। উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ অধ্যাপক ক্ষিতীশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। যে লাঠিয়াল-দের উপদ্রবে কৃষককুল এতদিন উৎকণ্ঠিত ছিল, এবারের ঐ সম্মেলনের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল সে লাঠিয়াল সমাবেশ। সে সমাবেশে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দু'শ' দক্ষ লাঠিয়াল যোগ দেয়। তারা সম্মেলনে লাঠি খেলার বিভিন্ন নিপুন কলা কৌশল প্রদর্শন করে। সে খেলার নেতৃত্ব দেন বাবু কালী চরণ বিশ্বাস, আর তাকে সহয়তা করেন বাবু হীরালাল বাইন। খেলাও হয়েছিল খুবই আকর্ষণীয়। সে লাঠি খেলা প্রদর্শনীতে লাঠিয়ালদের প্রতি কৃষকদের পূর্বের ভয় বিলুপ্ত হয়ে মনো-

বল শতগুণ বৃদ্ধি পায়।

অতঃপর ১৯৪৬ সালে মৌভোগে প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৩৬ সালে ঐ মৌভোগেই হয়েছিল প্রথম জেলা কৃষক সম্মেলন। আর তার দশ বছর পর ১৯৪৬ সালের প্রাদেশিক সম্মেলনে প্রস্তাব নেয়া হয় বিখ্যাত তেভাগা আন্দোলনের। আধিয়ার বা ভাগ চাষীগণ এতদিন অন্যের জমিতে উৎপাদিত ফসলের অর্ধাংশ পেতো। এখন থেকে পাবে দুই-তৃতীয়াংশ। উল্লেখ্য যে, সম্মেলন শেষে প্রাদেশিক নেতৃবৃন্দের অধিকাংশ ডুমুরিয়া গিয়ে তথায় আর এক ঐতিহাসিক সম্মেলন করেন।

উপরোক্ত তেভাগা প্রস্তাব অনুযায়ী কোথাও কোথাও সাময়িক কিছু ফলোদয় হলেও পরবর্তীতে তেভাগা চিরন্তন প্রথা বা ব্যবস্থায় পরিণত করা যায়নি। তা না করতে পারার পেছনে কারণও ছিল বিবিধ। তবে অন্যতম প্রধান কারণ—তেভাগা নিয়ে পার্টির মধ্যেই দ্বিমতের সৃষ্টি হয়। বিরুদ্ধবাদীদের মত ছিল,—"লাঙ্গল যার, জমি তার"—এটিই যদি কৃষক সমিতির সঠিক দাবী হয়, তবে প্রকৃত কৃষকদের পরের জমিতে চাষ করা বা সে চাষে উৎপাদিত ফসলের আধা বা দু'-তৃতীয়াংশ পাবার বা নেবার প্রশ্নইতো ওঠেনা! এর উত্তরে প্রস্তাবের পক্ষের ব্যক্তিদের বক্তব্য ছিল,—"লাঙ্গল যার, জমি তার"—এ দাবী যতদিন বাস্তবায়িত না হবে, ততদিন "তেভাগা" আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। তার উত্তরে বিরুদ্ধবাদীদের মত ছিল —"তেভাগার" দাবী যখনই তোলা হবে, তখনই "লাঙ্গল যার, জমি তার" —এ মূল দাবী আর প্রাধান্যে থাকবে না। বস্তুতঃ তেভাগা আন্দোলন নিয়ে দুই বিরুদ্ধ পক্ষের ঐ টানা পোড়েনে ফল যা ফলার তাই ফলছে। বিফুদা সে টানা পোড়েনে না গিয়ে খাজনার দায়ে হাজার হাজার বিঘা জমির উচ্ছেদকৃত কৃষকদের পূর্ব জমিতে

পুনর্বহাল এবং সে সব জমির ধান কেটে সমুদয় ধান কৃষকদের গৃহে তোলায় যত্নবান হন। কারণ, বিভিন্ন জমিদার যে হাজার হাজার বিঘা জমি খাস করে কৃষকদের বেদখল করেছিলেন এবং অবশিষ্টদেরও বেদখল করার উদ্যোগ করেছিলেন, তা প্রতিহত করাই ছিল এতদাঞ্চলের তৎকালীন প্রধান সমস্যা।

তেভাগা প্রসঙ্গে তদানিন্তন মুখ্য মন্ত্রী জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর আইন প্রনয়নের আশ্বাসে আশ্বস্ত হয়ে প্রচুর কর্মীও যথেষ্ট বিভ্রান্তও হয়ে পড়েছিলেন—যদি পরবর্তীতে তিনি অনুরূপ কোন আইনের প্রস্তাবই পরিষদে উত্থাপন করেননি।

ফ্লাউড্ কমিশন তেভাগার এ দাবীকে স্বীকৃতি দিয়ে বাংলা সরকারের কাছে নিম্নোক্ত মর্মে সুপারিশ পেশ করেছিলেন:

১৯২৮ সালের আইনে বর্গাদার সম্পর্কে ঐরূপ বিধান করা ভুল হইয়াছে। ... ... বর্গাদারকে প্রজা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। অর্ধেক ভাগের বদলে মালিক তিন ভাগের এক ভাগের বেশী আইনতঃ বর্গাদারের নিকট হইতে আদায় করিতে পারিবেন না। ★ সুপারিশটি ফজলুল হক মন্ত্রীসভার কাছে পেশ করা হলেও এই কৃষক-দরদী নেতা তাদের নিজেদের নিয়োজিত কমিশনের সুপারিশকে কার্যকর করার কোন ব্যবস্থা না করে বাংলাদেশের বিস্তৃত গ্রামাঞ্চলে বর্গাপ্রথাকে আধা ভাগের ভিত্তিতেই টিকিয়ে রাখতে সহায়তা করেন। কৃষকদের শ্রেণী শত্রুরা কৃষক উদ্ধারের নামে তাদেরকে রাজনীতিগত ভাবে কি প্রকার বিভ্রান্ত ও শোষণ করে, ফজলুর হকের নেতৃত্বে কৃষক প্রজা পার্টির রাজনীতি তার একটা উত্তম দৃষ্টান্ত। ★★

★ কৃষ্ণবিনোদ রায়: চাষীর লড়াই।

★★ বদরুদ্দীন উমর: চীরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলাদেশের কৃষক।

পুলিশী উপদ্রব ও জামাল ফকিরের দৃশ্যপটে আবির্ভাব

এবার আবার পুলিশী উপদ্রব প্রসংগে আসা যাক। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৫ সালের প্রথম দিক পর্যন্ত পুলিশ শোভনায় প্রবেশের তেমন একটা সুযোগ করে উঠতে পারেনি। তখন প্রতিপক্ষের তাড়া খেয়েই তাদেরকে পিটটান দিতে হতো। সে পরিস্থিতি উত্তরণের এক মোক্ষম মওকা মিলিয়ে দেয় শোভনা ইউনিয়নের নূতন প্রেসিডেন্ট জামাল ফকির। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, তিনি কৃষক সমিতির সহায়তায় প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট নকুলেশ্বর চক্রবর্তীকে পরাজিত করে মাত্র কয়েক মাস পূর্বে ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার সাথে সাথে ফুড্ কমিটিরও চেয়ারম্যান হন।

ছলনা করে উক্ত প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর পরই তিনি তার আসল রূপ ধারণ করেন। তিনি বিলক্ষণই জানতেন যে, তার স্বরূপ প্রকাশের সাথে সাথে যারা তার প্রতিবন্ধকতা করবেন তারা অপর কেউ নন, তারই নির্বাচন বৈতরণী পারের প্রধান সহায়ক কৃষক সমিতির সদস্যবৃন্দ। প্রেসিডেন্ট হওয়ার কয়েক মাস পরেই তার নিজস্ব কাঠ রাখার একটি ঘর—তাকে ঘর না বলে তাল পাতার চালা বলাই সমধিক যুক্তি যুক্ত। আবার সে চালাও ছিল বাহির বাড়ীর—পুড়ে ৩৭১ ধারায় বর্নিত চুরি ও ঘর জ্বালানী মামলা দায়ের করেন। আর সে মামলার আসামী করেন কৃষক সমিতির সক্রিয় সদস্য বাবু ক্ষেত্র মোহন বিশ্বাস, ললিত বিশ্বাস, হরিপদ মল্লিক, নগেন মল্লিক, নকুল, মল্লিক, সতীশ মল্লিক, সতীশ হালদার, অভয় চরণ সরদার (মাল), অভয় চরণ জোয়ার্দার প্রমুখকে। এরপর একদিন গুপ্ত খবর এলো যে,

সতীশ হালদার ও ক্ষেত্র মোহন বিশ্বাসকে পুলিশ গ্রেপ্তার করবে। তাই সতীশ বাবু তেলেগাতীর ওপার কলাবাড়ীয়া গ্রামে চলে যান। আর তার পরদিন তিন-চারশ' পুলিশ এসে সতীশ হালদারের বাড়ী ঘেরাও করে। ঐ বিপুল সংক্ষক পুলিশের আগমন দেখে সতীশ বাবুর স্ত্রী প্রভাবতীদি' তর্জনী তুলে পুলিশ অধিনায়ককে বললেন,—"গৃহে গৃহস্বামী নেই। খবরদার তিন জনের অধিক পুলিশ যেন আমার গৃহে প্রবেশ না করে।" তখন তিন তিন জন করে পুলিশ গৃহে ঢুকে তন্ন তন্ন করে তল্লাশি করে। কিন্তু তারা সতীশ বাবুকে না পেয়ে তার ৬/৭ টি ঘরের খুটি ভেংগে গায়ের জ্বালা মেটায়। অতঃপর জিয়লতলায় ৫০ জন পুলিশের একটি ক্যাম্প বসিয়ে অবশিষ্টরা চলে যায়। পরে সে ক্যাম্প থেকে পুলিশ এনে জামাল ফকির কৃষক কর্মীদেরকে আসামী ধরে দিতে বলে। এদিকে পার্টির নির্দেশ ছিল যে, সতীশ মল্লিক আর নগেন মল্লিক সে মামলায় পুলিশের কাছে ধরা দিতে পারবেন না। অপর দিকে পুলিশ সেই মল্লিকদেরকে ধরার জন্য হৈন্যে হয়ে খুঁজতে থাকে। কিন্তু তাদের ধরতে না পেরে অবশেষে নগেন মল্লিকের বাড়ীতে সর্বাধিক উপদ্রব চালিয়ে পুলিশ নিজেদের ব্যার্থতার জ্বালা মেটায়। জামাল ফকিরের সহায়তায় পুলিশ নগেন মল্লিকের অবর্তমানে তার ভ্রাতুস্পুত্র মনীন্দ্র মল্লিক ও অপরাপর ১৫ জনের এজমালী জমির সংরক্ষিত ১১০ সোলা (২৭৫ মণ) ধান ও বহু সোনা-দানা, কাপড় চোপড়, থালা-বাসন, এমনকি হাস মুরগী, গরু ছাগল নিয়ে যায়। সে লুন্ঠনে বাচ্চা ছেলে মেয়েদের জামা-প্যান্টও বাদ পড়েনি। তাই তাকে অপারেশন

প্রভাবতীদি'

না লুণ্ঠন বলবো জানিনে! যাক, তার পর পরই হরিপদ নন্দী কয়েক মণ চাল, ললিত বিশ্বাস কয়েকটি' থালাবাটী, গোপাল চন্দ্র আইস ৮/১০ টি জামা-প্যান্ট আর কে যেন কয়েকটি শাড়ী দিয়ে মল্লিকদের সে যাত্রায় অভুক্ত ও বিবস্ত্র থাকা থেকে রক্ষা করেছেন।

জানিনে পুলিশী ভাষায় একেই কম্বিং অপারেশন বলে কিনা তবে পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সে অপারেশনে মল্লিকদের সম্পূর্ণ নিঃস্ব করে দেয়া হয়েছিল। ১০/১৫টি অবোধ গরুকেও সে অপারেশন থেকে রেহাই দেওয়া হয়নি। গরুগুলিকে নিয়ে গিয়ে প্রায় এক মাস ডুমুরি-য়ার খোয়াড়ে রাখা হয়ে ছিল। খোয়াড়ওয়ালা অতগুলি গরুর খড় যোগাবেই বা কোথা থেকে। আর তা যোগাবারইবা এমনকি দায় ঠেকেছে কার? আর তাই মনীন্দ্র বাবুকেই সকাল-সন্ধ্যে দু'বেলা খড় যোগাতেও হয়েছিল। তদুপরি সে এক মাসের খোয়াড় খাজনাও কড়ায় গণ্ডায় তাকেই পরিশোধ করতে হয়েছে। আর ঐ এজমালী জমির ধান ১৯৪৮ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত জামাল ফকিরের সহায়তায় একই ভাবে লুঠ হয়ে এসেছে।

উক্ত ঘর জ্বালানী কেসে যে, • জন আসামীর ৭ বছর করে জেল হয়, তাদের মধ্যে সতীশ হালদার ও অভয় চরণ জোয়ার্দার এর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য।

অনুরূপ ছুতা খাড়া করে কৃষকদের বিরুদ্ধে তৎকালে বহুস্থানেই তদনুরূপ বহু কেস দেওয়া হয়েছে। উহা যে "বোগাস" বা বাজে এবং উদ্দেশ্য প্রনোদিত তারই নজির নিম্নে দেয়া হলো।

"১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে সুদূর রংপুরের ডোমার অঞ্চলে আধিয়ারদের দুর্বার তেভাগা আন্দোলনের মুখে জোতদাররা যখন একদম কোনঠাসা হয়ে পড়ে তখন সেখানকার একজন মুসলমান জোতদার তার এলাকায় এক মেলায় মুসলমান ব্যবসায়ীদেরকে বলে: তোমাদের দোকান-ঘর আমরা

পুড়িয়ে দেবো। তাতে ক্ষতি যা হবে তাও পূরণ করবো। তোমাদের শুধু বলতে হবে যে হিন্দুরা তোমাদের দোকান পুড়িয়েছে। (পক্ষান্তরে হিন্দু জোতদাররা অবস্থানুযায়ী তাদের অনুগত হিন্দু বা মুসলমানকে ভিন্ন ধর্মের লোকে পুড়িয়েছে বলতে শিখায়েছে)। দোকানীরা করজোড়ে বললো, "আমরা ওসবে নেই, বেশী জোর করেনতো আমরা দোকান পাট তুলে চলে যাচ্ছি।"★

এ থেকেই প্রমান মেলে যে, জমিদার—জোতদার তথা প্রচুর ভূমি মালিকগণ কি সুকৌশলে আইনকে তাদের কব্জার মধ্যে এনে কৃষকদেরকে কি নির্মম নির্যাতন ও নিপীড়নইনা করেছেন! পয়সার বিনিময়ে বিলক্ষণ বটতলার স্বাক্ষীওযে মেলে তাও আজ সর্বজন বিদিত।

যাক, ঐ ঘর জ্বালানী কেস দিয়ে কৃষক সমিতির কর্মীদের উপর পুলিশী নির্যাতনের সাথে সাথে জালাল ফকির ফুড কমিটির মাধ্যমে কৃষক জনসাধারণের চাল-চিনি-গম তুলে লাপাত্তা করতে লাগলেন। সে পরিস্থিতিতে জনসাধারণের টু'শব্দটিও করার জো'ছিল না, কারণ তাহলে 'সটি বা অপর কোন নতুন ঘর জ্বালানী কেসে পড়তে পারেন! জামাল ফকির তখন দু'ধারায় ফকিরী কেরামতি দেখান। এক ধারায় কৃষক সমিতির সক্রিয় কর্মীদের ঘর জ্বালানী কেস দিয়ে পুলিশী হয়রানী করা. আর অপর ধারায় পুলিশী হয়রানীর সুযোগে ফুড কমিটির আমদানীকৃত চাল-চিনি লোপাট করা। আর তারই সাথে সাথে ঘটে চারিত্রিক পদস্‌খলনের বিভিন্ন মুখী বহিঃ প্রকাশ! এভাবে দিন যত যেতে থাকে জনসাধারণের ধুমায়িত বিতৃষ্ণা. বিতশ্রদ্ধা ও ক্রোধ ততই পুঞ্জীভূত হতে থাকে। আর এ করেই এসে যায় ১৯৪৮ সালের মোক্ষম-জানুয়ারী। সে প্রসংগে পরে আসছি।

✩ সোমনাথ হোরের তেভাগা ডায়েরী ঃ সাংস্কৃতি, ফাল্গুন ১৩৩৮।

=৭

জীয়লতলা সংগ্রাম

১৯৪৬ সালের তেভাগা আন্দোলন তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন স্থানে দুর্বার রূপ নেয়। শোভনা এলাকার কৃষকদের পূর্বোল্লিখিত স্বতন্ত্র পরিস্থিতিতে তেভাগা আন্দোলন তেমন দানা বেঁধে ওঠতে পারেনি। তবে কৃষকগণ—"খাস জমি, আমাদের জমি"—এ শ্লোগানে দেয়ার সাথে সাথে—"আধি নয়,তেভাগা চাই"—এ শ্লোগানও দিয়েছে। জমিদারের হাজার হাজার বিঘা খাস করা জমি পূর্ব কৃষকদের দখলে রাখাটাই ছিল তখন স্থানীয় কৃষকদের প্রধান সমস্যা। তাই তারা তখন কৃষক সমিতির সহায়তায় উক্ত হারান জমি পুনর্দখল, আর সে দখলকৃত জমি চাষ এবং সে চাষে উৎপন্ন ফসল নিজ নিজ গৃহে তোলা নিয়েই সতত সক্রিয় ছিল।

এখানকার তৎকালীন দ্বন্দ্বটা আরও পরিস্কার হওয়া প্রয়োজন। জমিদার তার খাস করা জমি থেকে ইতিমধ্যেই কোথাও কোথাও পূর্বের কৃষকদেরকে উচ্ছেদ করেছেন। আর সে সব স্থানে কৃষক সমিতির সহায়তার দরুণ তখনও উক্ত কৃষকদেরকে উচ্ছেদ করা সম্ভব হয়নি, সেসব স্থানের ধান জমিদারগণ রাতের আঁধারে কেটে তাদের গোলায় উঠাতে চান। অন্য যে সব জমি ভাগ প্রথায় চাষ করা হয়েছে, সে সব জমির ধানও পূর্ব প্রথানুসারে জমিদারগণ নিজ নিজ গোলায় তুলে আধা আধি ভাগ হরতে চান। পক্ষান্তরে উচ্ছেদকৃত কৃষকদের বক্তব্য ছিল :— তাদের জমি জমিদারগণ অন্যায় ভাবে শুধু খাসই করেননি, ক্ষেত্র ভেদে বিনা নোটিশে কোর্টের মারফত একতরফা ভাবে শুধু খাস করেছেন—যা কেবল অন্যায়ই নয়, চরম অপরাধও বটে।

আর সে কারণেই কৃষকরা চায় উক্ত জমির ফসল প্রথমতঃ তাদের খামারে উঠুক। তারপর জমিদার যদি ঐ ফসলের তিন ভাগের এক-ভাগ নিতে চান তবেই তখন সে বিষয় বিবেচনা করা যাবে। কৃষকগণ তখন প্রকাশ্যে প্রচার করে বেড়াতো যে, শেষোক্ত ব্যবস্থাটি নাকি বিষ্ণু ঠাকুরের আইন। মোদ্দা কথা, জমিদার তার লাঠিয়াল ও পুলি-শের সহায়তায় ধান তুলতে চান তাদের কাচারীতে, আর কৃষক তা তুলতে চায় তাদের নিজ নিজ খামারে।

সে সময় (১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর) মাঘ মাসে একদিন প্রায় বিশ হাজার কৃষক জীয়ল তলায় উক্ত খাস করা জমির ধান কাটছিল। তখন তাদের আত্মরক্ষার জন্য প্রত্যেকের হাতেই কিছু না কিছু ছিল; যেমন—ঢাল, সড়কি, লাঠি ইত্যাদি। আর তার সাথে সাথে ছিল কৃষক সমিতির হাজার লাল পতাকা। কৃষকদের হাড়ভাঙ্গা শ্রমের ফসল - নিবিড় পাকা ধান দেখে কৃষকদের হৃদয় যেমনি হয়ে উঠেছে উদ্বেলিত, তেমনি পরশ্রমজীবী-পরগাছা জমিদারগণ এবার আর পূর্বের ন্যায় অন্যায় ভাবে তাদের ধান ছিনিয়ে নিতে পারবে না এ নিশ্চয়তা বহণকারী সমিতির অসংখ লাল পতাকা পত্‌পত্‌ করে উড়তে দেখেও তারা হয়েছে পরিতৃপ্ত। আর তাই পরম নিশ্চিন্তে কৃষকগণ ধান কাটছে, আর তার সাথে সাথে মুহুর্মুহু শ্লোগান দিচ্ছে, "জান দেবোতো, ধান দেবো না। খাস জমি, আমাদের জমি। ধান কেটে ঘরে তোল, নিজ খৈলানে ধান তোল। আধি নাই, তেভাগা চাই "ইত্যাদি, ইত্যাদি। শ্লোগানের পর শ্লোগানে মাঠ প্রকম্পিত হয়ে উঠে। সে শ্লোগানের ধ্বনি মাইলকে মাইল মাঠ পেরিয়ে প্রতিধ্বনিত হয়। ওহঃ, সে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। আর সে ঘটনা থেকেই অপূর্ব এক দৃশ্যের অব-তারণা ঘটে! ঠিক তেমনি সময় ডুমুরিয়া থানার ওসি সাত জন পুলিশ নিয়ে সেস্থানে এসে উপস্থিত হন। তারা তখন বিনা উস্কানীতে

এবং কোন প্রকার সতর্ক সংকেত না দিয়েই চৌদ্দ রাউণ্ড গুলি বর্ষণ করে। সে সময় কৃষক কর্মীদের প্রতি নির্দেশ ছিল: "গুলির সময় সকলে ঢাল—সড়কী নিয়ে ধান খেতের মধ্যে শুয়ে পড়বে। কেহই দাঁড়িয়ে থাকবেনা এবং প্রতিপক্ষকে সুযোগমত পেলেই সাবাড় করবে।" পার্টির উক্ত নির্দেশ সত্ত্বেও বাবু হাজারা পদ মণ্ডল ও অভয়চরণ সরদার (মাল) সে গুলির সময় শুয়ে পড়াকে আত্মমর্যাদা হানীকর বিবেচনা করেন, তাই তারা ঐ গুলির মুখে দাঁড়িয়ে লাঠি চালনা করতে থাকেন।

সে অবস্থায় পুলিশের গুলিতে হাজরাপদ বাবু ঢলে পড়েন। তবে বীর বিক্রম অভায়চরণ সরদার (মাল) এমন নিপুণ ভাবে লাঠিচালনা করল যে, গুলির আঘাতে তার হাতের এক একটি লাঠি টুকরা টুকরা হয়ে গেলও পুলিশের নিক্ষিপ্ত গুলির পর গুলি তার গায়ে সামান্যতম আঁচড় কাটতেও পারেনি। সুহৃদয় পাঠকদের স্মরণ করান যেতে পারে যে, ইনিই সেই 'সনামধন্য অভয় চরণ সরদার (মাল) যিনি ফেরাজতুল্লার ধান চুরি করে নেওয়ার সময় জমিদারের লোকজন-দের কানে ধরে আনতে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

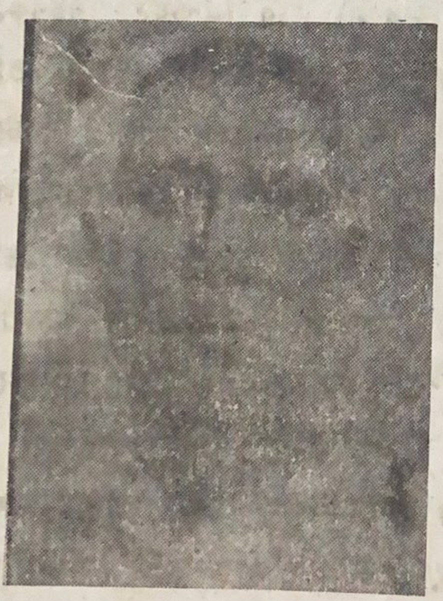

অভয় চরণ সরদার (মাল)

উল্লেখ্য যে, পুলিশের সে গুলিতে কৃষক সমিতির বনমালী বাবুও আহত হয়েছিলেন। এদিকে পুলিশের গুলিও এক সময় শেষ হয়ে যায়। আর সে শেষ হওয়ার সাথে সাথে তাদের বীর বিক্রমও আপছেই চুপসে যায়। অগণিত কৃষক-জনতা তখন তাদের ঘিরে ধরে ফেলে। ষ্ট্যাচুর ন্যায় দণ্ডায়মান পুলিশের হাতের রাইফেল গুলিও তারা তখন ছিনিয়ে নেয়। সে অবস্থায়ও বিষ্ণুদা কৃষকদের নিবৃত্ত করেন এবং অসহায়

পুলিশদের রাইফেলগুলি ফিরিয়ে দেন।

এখানে বিশেষ ভাবে লক্ষ্যনীয় যে, ঐ গুলির মুখে বুর্জোয়া নেতাদের ন্যায় নিশ্চিত দূরে না থেকে বিষ্ণুদা' কৃষকদের সাথে থেকেই নেতৃত্ব দিয়েছেন। পুলিশদেরকে কব্জার মধ্যে পেয়েও বিষ্ণুদা' কৃষকদেরকে নিস্ক্রয় করান এবং পুলিশদের রাইফেল ফিরিয়ে দেয়া কৃষকগণ হৃষ্ট-চিত্তে গ্রহণ নাকরলেও বিষ্ণুদার আদেশই তারা মেনে নিয়েছে। আর সে কারণেই কৃষকগণ হাজরা বাবুর বদলা নিতে বা ছিনিয়ে নেয়া সাত সত্তটা রাইফেল নিজেদের দখলে রাখতে পারেনি। তাতে কৃষকদের মনোবেদনাও যথেষ্ট ছিল। বিচক্ষণ পাঠকই বলতে পারেন যে, বিষ্ণুদার তখনকার সে উদারতা সঠিক হয়েছিল কিনা। তবে পুলিশ মুক্তি পেয়ে এবং তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া রাইফেল ফেরৎ পেয়ে বিষ্ণুদার কাছে ক্ষমা চেয়ে বিদায় নেয়।

পক্ষান্তরে কৃষক-মুক্তি আন্দোলনের অগ্রদূত বাবু হাজরা পদ মণ্ডল পুলিশের গুলিতে মরে অমর হলেন। আর বাবু অভয় চরণ সরদার (মাল) - এর অসম সাহস তথা জীয়লতলায় কৃষকদের সে বিজয় কেতু উড্ডয়নের অবিস্মরনীয় ঘটনাবলী ইতিহাসের পাতায় এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়—এর সংযোজন হলো।

বিষ্ণুদার সেই উদারতার জন্য অকৃতজ্ঞ পুলিশ পরবর্তীতে কিন্তু আর কৃতজ্ঞ রইলো না। হাজরা পদ বাবুর মৃত্যুর পর দিনই পঞ্চাশ—ষাটজন পুলিশ ও সিপাহী একটি লঞ্চ নিয়ে জীয়ল তলায় গিয়ে উপস্থিত হয়। তাদের উপস্থিতির সাথে সাথে কৃষক সমিতির হাজার হাজার কর্মী এবং বিদ্যাধরীদির নেতৃত্বে অসংখ মহিলা পুলিশ ও সিপাহীর নদী তটে ওঠার বিরুদ্ধে এক দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তোলে। তারা তটে ওঠার উদ্যোগ নিলেই সমিতির কর্মীগণ "পুলিশ—মিলিটারী ফিরে যাও। লাংগল যার, জমি তার। জমিদার শৈলেন- ঘোষ ধীরেন ভট্টাচার্জী

নিপাত যাক্, নিপাত যাক"—ইত্যাদি বলে মুহুর্মুহু শ্লোগান দিতে থাকে। কৃষকদের সে দুর্বার প্রতিরোধের মুখে পুলিশ-মিলিটারী তিন দিন ধরে বহু চেষ্টা করেও উপরে ওঠতে পারেনি। পুলিশের সে নাজুক অবস্থায় এস, পি সাহেব প্রতিরোধকারী মহিলাদেরকে সম্বোধন করে—"মা সকল, তোমারা চলে যাও। আমরাও চলে যাই"—বলে লঞ্চ নিয়ে কিছুটা পেছনে সরে যান। মহিলারা সে আশ্বাসে এবং সরল বিশ্বাসে চলে যায়। এভাবে পূর্ববর্তী প্রতিরোধ বেশ কিছুটা শিথিলও হয়ে পড়ে। আর সে শিথিল অবস্থায় রাতের আঁধারে যশোর, বাগের-হাট ও খুলনা থেকে আরও পুলিশ এসে শেষ রাতে তটে নেমে অভয় চরণ জোয়ারদারের বাড়ী ঢুকে পড়ে এবং জামাল ফকিরের ইংগিতে অভয় চরণ জোয়ারদারের বাড়ীর ধান লুট করে শৈলেন ঘোষদের দিয়ে দেয়। তাদের ধারণা ছিল যে, কৃষকগণ শৈলেন ঘোষের ধান কেটে এনে অভয় চরণ জোয়ারদারের বাড়ী রেখেছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সে ধান কৃষকরা তাদের নিজ নিজ খামারেই তুলেছিল। এদিকে পুলিশের ধান লুট ও গৃহের আসবাবপত্র তছনচ করা দেখে অভয় বাবুর স্ত্রী যমুনাদি' আর নীরবে দাঁড়ায়ে থাকতে পারেননি। তিনি তখন লুণ্ঠণকারী জনৈক সশস্ত্র পুলিশকে বটির আঘাতে ধরাশায়ী করেন।

যমুনাদি'

সন্তান বৎসল মায়েরা একবার বিগড়ে গেলে যে কি রুদ্ররূপ ধারণ করে বসেন প্রসংগতঃ সোমনাথ হোরের "তেভাগা ডায়রী" শীর্ষক নিবন্ধ থেকে এখানে একটা উদাহরণ দিই। রংপুর জেলার ডোমারে তেভাগা আন্দোলনের সময় কৃষক নেতা বাবু মনিকৃষ্ণ সেন সংগী-সাথী সহ স্থানীয় এক আধিয়ার (কৃষক) বাবুরি বর্মনের বাড়ী ভাত খেতে বসেছিলেন। সে সময় এক মাড়োয়ারী জোদ্দার ভাড়াটে লোক জন সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়ে নিজেই বাড়ীর

কয়েকজন লোক নিয়ে মদিদাকে খাওয়া অবস্থায় অতর্কিতে লাঠি দিয়ে আঘাত করে। তখন বাবুরী বর্মনের বৃদ্ধা মা গাইন (ধান ভানার কাঠের লাঠি) দিয়ে আততায়ী মাড়ুয়াকে প্রচণ্ড প্রহার করেন। ইত্যবসারে লোকজন এসে পড়লে গুণ্ডারা দ্রুত পালিয়ে প্রাণ বাঁচায়।

লেখক পরে বাবুরি বর্মনের মাকে যখন জিজ্ঞেস করলেন—"মাড়োয়ারীকে যে আপনি মারতে গেলেন, ভয় করলো না?" উত্তরে তিনি কি বললেন, জানেন? "ভয়! ভয় কেন? আমার ছাওয়ালগুলিকে (ছেলেগুলিকে) ওরা ডাঙাইছে (মেরেছে) আর আমি ডাঙাইমুনা?" বস্তুতঃ বাবুরি বর্মনের বৃদ্ধা মা—এর তখন দাঁত পড়ে গেছে, মুখ দিয়ে ভালো ভাবে কথাও বেরোয়না। চামড়ার ভাঁজে চোখ ঢুকে গেছে। ভালো ভাবে দেখতেও পারেন না। বয়সের ভারে হাটতে চলতেও পারেন না। এহেন বৃদ্ধা মা গাইন দিয়ে গুণ্ডাদের আঘাত হানতে দেখলে শোষিত—নির্যাতিত মানুষের শিরদাড়া আপনেই ঋজু হয়ে আসে না?

যাক, যা বলছিলাম তাই বলি। উপরোক্ত ধান লুটের পর সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী যমুনাদি' 'শশী ভূষণ বিশ্বাস (পাগল), শশী ভূষণ মল্লিক, (পাতিবুনিয়ার), প্রমুখ ৩০/৩৫ জন কৃষক কর্মীকে ধরে নিয়ে যায়।

এদিকে পুলিশ অভয়চরণ জোয়ারদারের বাড়ীর ধান লুট করার পর কৃষক সমিতি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে বিবাদি করে খুলনা কোর্টে এক মামলা দায়ের করতে যায়। খুলনা কোর্ট তা গ্রহণ না করায় মিঃ জ্যোতিবসু তখন হাইকোর্টে সে মামলা দায়ের করেন। দীর্ঘ দিন সে মামলা চলার পর বিচারে কৃষক সমিতি জয়ী হয় এবং রায়ে ক্ষতিপূরণ বাবদ ১২,৫০০ টাকা ডিক্রী পায়। জমিদার শৈলেন ঘোষের আট হাজার টাকা জরিমানা হয়। ইত্যবসারে ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগ হয়। শুনাযায় ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর তখন উপায়ান্তর না পেয়ে ঢাকা গিয়ে হাইকোর্টের তদানিন্তন চীপ জাষ্টিস মহামান্য আকরাম

সাহেবের নাকি স্মরণাপন্ন হয়েছিলেন। কিন্তু তাতে কোন ফলোদয় হয়নি। অগত্যা তিনি উক্ত কোর্টেরই অপর বিচার পতি এলিস সাহেবের স্মরণাপন্ন হলে তিনি নাকি অপর এক ধারায় সুকৌশলে ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের চাকুরী বহাল ও ডিক্রীর টাকা মওকুপ করে দেন। তাতে শৈলেন ঘোষের জরিমানা ও মওকুপ হয়ে যায়।

উল্লেখ যে, মিঃ জ্যোতিবসুর দায়েরকৃত মামলা হাইকোর্টে চলা কালে অভয় বাবুর পুত্র সুধান্ত জোয়ারদার সে মামলা সংক্রান্ত ব্যাপারে খুলনা এসে শিশুবর ফৌজদার প্রমুখের সাথে সাক্ষাত করতে এলে জমিদারের লোকজন ফৌজদার বাবুর অলক্ষে সুধান্ত বাবুকে ধরে শৈলেন ঘোষের বাড়ী নিয়ে যায়। শৈলেন ঘোষের মা তখন সুধান্ত বাবুকে হাইকোর্ট থেকে মামলা প্রত্যাহারের জন্য বহু অনুনয় - বিনয় করেন এবং তার জন্য সাদা কাগজে সই দিতে বলেন। কিন্তু সুধান্ত বাবুর ছিল একই কথা—"আমায় মেরে ফেললেও আমি সই দেবোনা। ইহাতে আমার এখতিয়ার নেই।" এদিকে ফৌজদার বাবু সুধান্ত বাবুকে না দেখে আধ ঘণ্টার মধ্যে প্রচুর পুলিশ নিয়ে শৈলেন বাবুর বাড়ী ঘেরাউ করে। অবস্থা বেগতিক দেখে শৈলেন বাবুর মা সুধান্ত বাবুকে পুলিসের সম্মুখে নিয়ে গিয়ে বলেন,—"এইতো সুধান্ত! আমিই ওকে ডেকে এনেছি। ওর কোনই অমর্যাদা করিনি" ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এদিকে যমুনাদি' যখন বটি দিয়ে পুলিশকে কুপিয়ে ধরাশায়ী করেন তখন তিনি পুলিশের লণ্ড ভণ্ড করা দেখে অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়ে ছিলেন। তিনি ঐ কোপ মেরেই পার্শ্ববর্তী খালে পড়ে যান। তখন তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞান। তখন পুলিশ ও জমিদারের গুণ্ডা বাহিনী তাঁকে তুলে তাঁর পৃষ্ঠে ও বাহুতে রাইফেলের আঘাত হানে। এক দুঃবৃত্ত মাছ ধরার কলা (কোচ) দিয়ে যমুনাদির বাম হাতে কোপ মারে গায়ের ঝাল

মেটায়। আর তেমনি রক্তাক্ত অবস্থায় যমুনাদি'কে লক্ষ্যে করে পুলিশ খুলনা নিয়ে যায়। রাতে হাজতে রাখার পর পরদিন ভোরে ছাড়া পেলে যমুনাদি' খুলনা হাসপাতালে ভর্তি হন। তিনি হাসপাতালে তিন দিন থেকে একটু সুস্থ হলে পুলিশের কানে পানি যায় যে, যমুনাদি'কে এভাবে ছেড়ে দেয়াতো ঠিক হয়নি! পুলিশ পুনরায় তাঁকে এ্যারেষ্ট করার জন্য যখন হাসপাতালে পাঁয়তারা করতে থাকে তখন পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে তাঁকে নিয়ে ফ্যারিঘাটে বিথীর বাবা—শচিন মিত্র উকিল মহাশয়ের বাড়ী লুকিয়ে রাখা হয়। এদিকে পুলিশ তিন দিন ধরে যত্র তত্র খুঁজে বিথীদের বাড়ী যাবার আগমূহূর্তেই যমুনাদি'কে সরায়ে পাঠান হয় যশোরের শৈলকোপা গ্রামে। তারপর তথা থেকে পাঠান হয় কোলকাতা। সেখানে থাকেন তিনি তিন বছর। এদিকে এ অবলাকে ধরার জন্য সবলা পুলিশ একের পর এক স্থানে যে ভাবে পাগলের মত হানা দিয়ে বেড়ায়েছে তা দস্তুর মত এক উপ-ভোগ্য ব্যাপার।

উল্লেখ্য যে, যেদিন পুলিশ বাহিনী অভয় চরন জোয়ারদারের বাড়ীর ধান লুট করে সেদিন রাতেই কৃষক সমিতির লোকজন শৈলেন ঘোষের বলাবুনিয়া কাচারী থেকে সমপরিমান ধান নিয়ে আসে। তাতে দারুণ এক রোমাঞ্চকর—উত্তেজক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। আর তার পর থেকেই চলে পুলিশী জুলুম ও নির্যাতন। সে জুলুম ও নির্যাতনে ইন্ধন যোগিয়েছেন প্রেসিডেন্ট জামাল ফকির। সে জুলুম ও নির্যাতন চলাকালে ১৯৪৭ সালে ১৪ই আগষ্ট ভারত বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান ও হিন্দুস্তান নামে দু'টি পৃথক রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়। আর তাতে ডুমুরিয়া পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়।

জামাল ফকির হত্যা

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য সময় অর্থাৎ ১৯৪৬-৪৭ সালে জামাল ফকিরের সহায়তায় পুলিশী নির্যাতনে একদিকে কৃষক সমিতির কর্মীগণ জামাল ফকিরের প্রতি অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। অপর দিকে ফুড কমিটির আমদানীকৃত চাল, চিনি, তেল, নুন নিয়ে ছিনিমিনি খেলায় জনসাধারণও তার উপর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে। আরও উল্লেখ্য যে সে সময় জামাল ফকির বিরুদ্ধবাদী ও নিরীহ জনসাধারণের উপর অন্যায় ভাবে ধানের 'লেভী' ধার্য করেন এবং তার মুখ পাতাম জনৈক আইন প্রয়োগকারী শ্বশুরকে দিয়ে কাহাকেওবা শায়েস্তা করেন আবার টাকার বিনিময়ে কাহাকেওবা পরিত্রাণ দেন। তাতে নিপীড়িত জনতা তার উপর আরও ক্ষিপ্র ও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। এদিকে ডুমুরিয়ার (মসিগোনার) জাতীয়তাবাদী নেতা মাওলানা আহম্মদ আলী সাহেবের পুত্র জনাব নুরুজ্জামানের এক তথ্য বিবরণীতে জানা যায় যে, মাওলানা সাহেব সে সময় একবার কোলকাতা থেকে এসে ডুমুরিয়া হাটে গেলে জনসাধারণ তাঁকে জামাল ফকিরের কীর্তি-কাহিনী জানায়ে প্রতিকারের অনুরোধ করে। তারা ঐ কীর্তির বিবরণ দিতে গিয়ে এও বলে যে, ফকির এক নাগারে নয়টি স্ত্রী রাখা সত্ত্বেও তার পছন্দসই অপরাপর মহিলাদেরও উত্যক্ত করেন। বিশেষ করে এই নারী সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গটি শুনে মাওলানা সাহেব দারুণ ক্রোধান্বিত হয়ে ওঠেন। তিনি তৎক্ষণাত লোক পাঠায়ে জামাল ফকিরকে ডেকে আনেন এবং জিজ্ঞেস করেন—"কি হে জামাল, তুমি

নাকি ন'টি স্ত্রী রেখেছ ? ফকির তাতে একটু মৃদু হেসে উত্তর দেন,—"দোয়া করেন হুজুর, আল্লাহ্ ইচ্ছে পুরালে যেন এক সাথে বিশটি স্ত্রী রাখতে পারি।" একথা শুনে মাওলানা সাহেব ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন এবং হাতের লাঠি দিয়ে একটি আঘাত হানেন। এদিকে মাওলানা সাহেবের দেখা-দেখি ক্রুদ্ধ জনতা তখন আরম্ভ করে হাটুরে কারবার। তাতেই নাকি বারটা বেজে যায়।

উক্ত হাটুরে কারবারের পরের হাটের দিন ডুমুরিয়ার বারোয়ারী বাজারে (রেজিষ্ট্রী অফিসের সম্মুখে) ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের উপস্থিতিতে জামাল ফকির প্রসঙ্গ নিয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় জামাল ফকিরের কুকীর্তির বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে মাওলানা সাহেব এই বলে সমাপ্তি টানেন যে, "মুসলিম শরিয়ত অনুযায়ী একজন পুরুষ একাধারে চারটি স্ত্রী রাখতে পারে। কিন্তু জামাল ফকির রেখেছেন ন'টি (কাহারও কাহারও মতে এগারটি—লেখক)। শরিয়তের এ বরখেলাপের জন্য তাকে কতল করা উচিৎ। আর সে কতল রাষ্ট্রকেই করতে হবে ; জনগণ নয়।"

সভা সমাপ্তিতে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব নাকি বলেছেন যে, তিনি মাওলানা সাহেবকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করেন। তিনি নাকি আরও বলেছেন যে, ১২,০০০ কোল অধ্যুষিত ডুমুরিয়ার জনগণ যদি জামাল ফকিরের অন্যায় আচরণের প্রতিকার করতে না পারেন তবে তাদেরকে তার প্রাশ্চিত্য ভোগ করতেই হবে।

উপরোক্ত ঘটনার পর জামাল ফকিরের বিরুদ্ধে সর্বস্তরের জনগণের পুঞ্জিভূত ক্ষোভে ও প্রতিশোধ স্পৃহা যখন তুঙ্গে ওঠে তখন অর্থাৎ ১৯৪৮ সালের জানুয়ারীর শীতের এক মোক্ষম রাতে ৫০/৬০ জন লোক জামাল ফকিরকে গৃহ থেকে টেনে নিয়ে শরীরের বিভিন্ন স্থানে দা' দিয়ে কুপিয়ে এবং গলা পুচিয়ে কেটে হত্যা করে।

মজার ব্যাপার এই যে, যমের হাতে পড়লে ইঁদুর বাঁচার জন্য যেমন গর্ত খোঁজে জামাল ফকিরও আক্রমণকারীদের হাত থেকে এক পর্যায়ে ফসকে গিয়ে নিজের ধানের গোলার নীচে গিয়ে বাঁচার চেষ্টা করে। কিন্তু যমদুতরা তাকে টেনে এনে তার সে চেষ্টাও ব্যর্থ করে দেয়। হায়, এই ইঁদুরই ক'দিন মাত্র আগেও ডুমুরিয়াবাসীদের কি নির্মম উৎপীড়নই না করেছেন? উৎপীড়কদের যে কি নির্মম পরিণতি হয় এটা তারই একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

এদিকে জামাল ফকির হত্যার পর দারোগা কালীচরণ কুণ্ডুর নেতৃত্বে খুলনা থেকে এক বিরাট পুলিশ বাহিনী এসে দু'ভাগ হয়ে এক ভাগ উত্তর দিকে শোভনা স্কুলে গিয়ে আর অপর ভাগ দক্ষিণ দিকে বিশ্বাসদের খেজুর বাগানে গিয়ে ক্যাম্প করে। অতঃপর ২০ ধারা জারি করে পুলিশ বাহিনী দু'ক্যাম্প থেকে সাড়াসী অভিযান চালায়। তখন থেকে কৃষকদের উপর চলে নির্বিচারে নির্যাতন, জুলুম আর হয়রানি। আর তারই সাথে সাথে আগন্তুক অতিথি মেহমানদের উদরপূর্তির জন্য চলে কৃষকদের ধান, চাল, হাঁস, মুরগী, মায় গরু, ছাগলের দেদার লুণ্ঠন। শুধু কি তাই? কৃষক সমিতির কর্মীদের আশ্রয় ও প্রশ্রয় দেয়ার ছুতা ধরে কৃষকদের পাকা ঝাল, তরুতাজা শাখ-শব্জী পুষ্ট বেগুন আর কপির ক্ষেত ধ্বংস করে দেয়। মোট কথা সে এক অবর্ণনীয় অত্যাচার। সে অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে যারা পেরেছে তারা তখন ভারতে চলে যায়, আর যাদের চলে যাবার সুযোগ ছিল না বা যারা যেতে চায়নি তারাই নির্যাতনের শিকার হয়েছে।

ছয় মাস ধরে একটানা পুলিশী নির্যাতনের পর পুলিশের স্থলে এসে যায় পাক বেলুচ মিলিটারী। তারাও দু'ভাগ হয়ে একভাগ আস্তানা নেয় ডাঙ্গার শোভনা স্কুলে আর অপর দল নেয় আবাদের জীয়লতলা স্কুলে। তাদের আগমনে নুতন উদ্যমে আরও দেড় বছর

অত্যাচার চলে।

উপারোক্ত সময় পুলিশ ও সিপাহিরা একদল কৃষককে ধরে খুলনা জেল হাজতে প্রেরণ করে। চেষ্টা তদবীর করে তাদের তখন জামিনের ব্যবস্থা করলে পরক্ষণেই আর একদলকে ধরে হাজতে পাঠানো হয়। সে অবস্থায় কৃষক সমিতির লোকদেরকে জামিন ও মুক্ত করার জন্য খুলনায় একটি লীগাল ডিফেন্স কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটির ল' ক্লার্ক ছিলেন বাবু রামলাল বিশ্বাস। উকিল ছিলেন সত্যেন সেন (বর্তমান এ, পি, সি, স্কুলের পশ্চিম পার্শ্বের বাড়ী) আর মোক্তার ছিলেন শিশুবর ফৌজদার (যিনি আজও কৈয়া থেকে হেটে এসে কোর্ট করেন), আর ছিলেন রওনাকুল ইসলাম (যাকে একাত্তরে পাক সেনারা হত্যা করেছে)। এ'ত্ব'জন মোক্তার নাম মাত্র ফি নিয়ে কৃষক সমিতির সদস্যদের জামিন করিয়ে দিতেন। তবে জামিন বাবদ তারা অতিরিক্ত ফি নিতেন না। দুঃখের হলেও সত্য যে, তাদের সেই হৃদায়তার জন্য অপরাপর মোক্তারগণ তাদেরকে মোক্তার এসোসিয়েশন থেকে বয়কট করেন।

ঐ সময় পর্যায়ক্রমে পুলিশ ও সিপাহির হয়রানী, তাড়না এবং কৃষকদের যথেচ্ছ ভাবে ধরে জেল হাজতে প্রেরণে শোভনাবাসী অতিষ্ঠ হয়ে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে এক গণ-দরখাস্ত করে। তাতেও যখন কোন ফলোদয় হলো না তখন বাবু সচীন বোস (খোকাদা) ও জনাব আব্দুল জব্বার এ্যাডভোকেট প্রমুখ মিলে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে এক ডেপুটেশন দেন। আর তারই ফলে শোভনা থেকে মিলিটারী তুলে নেয়া হয়। সে সমায় পুলিশ ও মিলিটারী দীর্ঘদিন শোভনা স্কুলটিকে তাদের দখলে রাখায় ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনাই শুধু বন্ধ হয়নি, স্কুলটিরও বিপুল ক্ষতি হয়েছে।

মীর জাফরের মীর জাফরী : বিষ্ণুদা' বন্দী

এদিকে মিলিটারী তুলে নিলেও জামাল ফকির হত্যা মামলা চলতেই থাকে। তাতে বহু কৃষক-কর্মীকে ৩৯৬ ধারায় আসামী করা হয়। যাদেরকে আসামী করা হয় তাদের মধ্যে বাবু নকুল মল্লিক, বিষ্ণুচ্যাটার্জী, নগেন সরকার, রঞ্জন ব্রম্মা, নগেন মল্লিক, নগেন বিশ্বাস, অনিল মল্লিক প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে প্রথম দিকেই ধরা পড়ে ছিলেন বাবু নগেন সরকার (ভদ্রাদিয়ার), রঞ্জন ব্রম্মা প্রমুখ।

নগেন সরকার, রঞ্জন ব্রহ্ম প্রমুখ ধরা পড়ার পর বিষ্ণুদাকে ধরার জন্য পুলিশ হন্যে হয়ে দীর্ঘদিন ঘুরতে থাকে। কিন্তু তারা তাঁকে কিছুতেই ধরতে পারেনি। ছদ্মবেশী পুলিশ এই মাত্র অনতিদূরে তাঁকে দেখালো, আর পর মূহুর্তেই তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন বা দেখা গেল যে, তার স্থলে মালকোচা মারা জনৈক কৃষক নিবিষ্ট মনে হাল চালাচ্ছেন। কখনওবা তাঁকে নদীর পাড় বা খালের ধারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। আর পরক্ষণেই তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তদস্থলে দেখা গেলো যে, একজন মাঝি মাথায় গামছা এঁটে নিপুণ হাতে নিবিষ্ট চিত্তে ঐ নদী বা খাল পাড়ি দিচ্ছেন। আর তাই শত চেষ্টা করেও পুলিশ তাকে ধরতে পারেনি। হুলিয়াতো তাঁর বিরুদ্ধে জারিই রয়েছে! এতদসত্বেও তাকে ধরা যখন পুলিশের কুয়তে কুলালো না, তখন অসহায় সরকার ঘোষণা করলেন যে, বিষ্ণু চ্যাটার্জীকে ধরে দিতে পারলে এক হাজার টাকা পুরস্কার দেয়া হবে। তাতেও তাকে ধরা গেল না। এমন দেশ প্রেমিককে ধরে দেবে কোন পাষণ্ড? অবশ্য সে পাষণ্ডও পরে পাওয়া গেল।

১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসের এক রাতে বিষ্ণুদা' নলঘোনায় এক সভা সেরে মৌখালী নদী দিয়ে ধানিবুনিয়া যাচ্ছিলেন। তখন রাতের আঁধার পেরিয়ে উষার উদয় হয়। এমনি সময় গ্রামের জনৈক পুলিশের দালাল একজন সাথী নিয়ে সে স্থানে পাখি শিকার করতে আসে। দালালটি বিষ্ণুদাকে দেখেই চিনে ফেলে। বিষ্ণুদা' তখন নৌকার দাঁড় বাচ্ছিলেন, আর তার সহযোগী অনিলদা' বৈঠা ঠেলছিলেন।

দালালটি বিষ্ণুদাকে ডেকে বলল: "বিষ্ণুদা' একটু আস্তে বান, কথা আছে।" পূর্ব থেকেই তারা পরস্পর পরিচত ছিলেন। আর তাই তার আস্তে বাওয়ার অনুরোধে বিষ্ণুদা' নৌকার গতি মন্থর করে দেন। ইত্যবসরে পাপিষ্ট দালালটি নৌকার কাছে এসেই বিষ্ণুদার জামার কলার ধরে টান মারে। অপ্রত্যাশিত ঐ আক্রমণ থেকে মুক্ত হবার জন্য বিষ্ণুদা' প্রবল বেগে ধস্তা ধস্তি করতে থাকেন। সে ধস্তা ধস্তিতে উভয়েই মৌখালী নদীতে পড়ে যান। তখন বিষ্ণুদার পকেটে ছিল একটি রিভলবার। দুবৃত্ত থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য অগত্যা তিনি তাই চালিয়ে দিলেন। কিন্তু হায়, আপ্‌শোস্‌, সে রিভালবারের গুলি ছিল একটিই। আর সে গুলিও নদীতে ভিজে হয়ে গিয়েছিল অকেজো। আর সে সুযোগেই দুবৃত্ত দালাল নৌকার লগি দিয়ে বিষ্ণুদার মাথায় আঘাত হানে। সে আঘাত পেয়েও বিষ্ণুদা' যখন দৌড়াতে উদ্যত হন তখন দুবৃত্ত-দালাল ও তার সাথী বিষ্ণুদাকে ধরে ফেলে। এদিকে বিষ্ণুদার সাথী অনিলদা' কিন্তু ষ্ট্যাচুর ন্যায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। হঠাৎ আক্রান্ত হওয়াতেই অনিলদা' হয়তো বা হতভম্ভ হয়ে পড়েন। তবে হতভম্ভ না হয়ে যদি কিছুটাও সক্রিয় থাকতেন, তবে পরবর্তী অধ্যায় পরিবর্তীত রূপেই প্রবাহিত হতো।

যাক সে কথা 'এদিকে— "দালালের বাড়ী থেকে বিষ্ণুদাকে বাঁশে বেঁধে ডুমুরিয়া থানায় নেয়া হয়েছে"—এ সংবাদ চতুর্দিকে

ছড়িয়ে পড়ার পর পরই ধানিবুনিয়া, বকুলতলা, জয়খালী, কানাইডাঙ্গা সাহস, শোভনা প্রভৃতি অঞ্চল থেকে হাজার হাজার কৃষক—"বিষ্ণুদার মুক্তি চাই। লাঙ্গল যার, জমি তার"—ইত্যাদি ধ্বনি দিতে দিতে এসে ডুমুরিয়া থানা ঘেরাও করে ফেলে। অবশ্য "জনতার ঢল বিষ্ণুদাকে মুক্ত করার জন্য ডুমুরিয়া অভিমুখে আসছে" শুনেই ডুমুরিয়ার পুলিশ বিষ্ণুদাকে লঞ্চে করে খুলনা প্রেরণ করে।

প্রত্যক্ষদর্শী ডাঃ বগলা ভূষণ রায়ের বিবরণ মতে, বিষ্ণুদাকে ডুমু-রিয়া নিয়ে গেলে ডুমুরিয়ার তৎকালীন সাব-রেজিষ্ট্রার বিষ্ণুদার প্রতি উদ্দেশ্য পূর্ণ ভাবে তাকালে বিষ্ণুদা' তার প্রতি দাঁত কামড়ে— চক্ষু বিস্ফারিত করে এমনি ভাবে তাকালেন যে তাতে দস্তুর মত ভয় হয়।

প্রবাদ আছে যে, ঢেকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। বিষ্ণুদা খুলনা জেলে গেলেও তাঁর কর্ম বিরতি ঘটেনি। সে সময় জেলে কয়েদীদের ধূমপান নিষিদ্ধ ছিল। কোন কয়েদী জেলে বিড়ি খেলে শাস্তি ভোগ করতে হতো। জেল বহির্ভূত কোন অফিসার জেল পরিদর্শনে এলে কয়েদীদের দাঁড়িয়ে 'সেলিউট' করতে হতো। তা ছাড়া যেন-তেন উছিলায় পাগলা ঘন্টি পিটিয়ে কয়েদীদের গণ পিটুনী দেয়া হতো। আর বরাদ্দকৃত মাছ, মাংস চুরি করে কয়েদীদের বঞ্চিত করা ছিল নিত্যকার সাধারণ ঘটনা। সবচেয়ে মর্মান্তিক প্রথা ছিল, অধুনা পশু-দের দিয়ে যে ঘানি টানা হয় তখন সে ঘানি টানা হতো কয়েদীদের দিয়ে।

বিষ্ণুদা' জেলে গিয়ে অপরাপর কয়েদীদের বললেন;- "বাহিরের কেউ জেল পরিদর্শনে এলে দাঁড়িয়ে তাকে 'সেলিউট' করতে হবে না। কারণ যারা পরিদর্শনে আসেন তারা বেতন ভুক্ত কর্মচারী মাত্র। আর আমরা হলাম মুক্তি কামী দেশ প্রেমিক। আমাদের পয়সাতেই যাদের

মাইনে হয়, সে কর্মচারীদের দেখলে আমাদেরকে দাঁড়িয়ে 'সেলিউট' দেয়ার প্রশ্নই উঠে না। তার কথার যথার্থতা উপলব্ধি করে সকলে সায় দেন। এদিকে জেল কর্তৃপক্ষ দেখলেন যে, এ আবার নুতন কোন উপদ্রব! তারা তখন বিষ্ণুদাকে ৫নং সেলে প্রেরণ করে নিশ্চিত হন। উল্লেখ্য যে, এর সাত-আট মাস পর নকুল মল্লিককে ধরে ১নং সেলে প্রেরণ করে। আর বিষ্ণুদা' ধরা পড়ার আট মাস আগে ধরা পড়েন নগেন সরকার, রঞ্জন ব্রহ্মা প্রমুখ। যাক, বিষ্ণুদাকে সেলে প্রেরণের প্রতিবাদে অপর কায়েদী বাবু কালীপদ ঘোষ সকল কয়েদীদের প্রতি খাওয়া বন্ধ করার আবেদন করেন। সে অবস্থায় কালীপদ ঘোষ মহাশয়কেও সেলে প্রেরণ করা হয়, আর তাতে হিতে বিপরীত হয়। সমস্ত কয়েদী তখন একনাগাড়ে খাওয়া বন্ধ করে দেন। কর্তৃপক্ষের তখন টনক নড়ে। কিন্তু সে দুর্বার আন্দোলন তখন অনেক দূরে এগিয়ে গিয়েছে। কয়েদীরা ভালো খাবার, পর্য্যপ্ত জল সরবরাহ, কয়েদীদের দ্বারা ঘানিটানা বন্ধ করা ইত্যাদি ৩৯টি দাবী নিয়ে ৬৫ দিন 'হাংগার ষ্ট্রাইক' করে। সে অবস্থায় পুলিশ মরিয়া হয়ে জেলে লাঠি চালায়। উল্লেখ্য যে, সে সময় সাতক্ষীরার আনোয়ার হোসেনও খুলনা জেলে ছিলেন। তবে পুলিশের সে লাঠি চালানোর পূর্বেই তাকে রাজশাহী জেলে প্রেরণ করা হয়। আর সেখানে ১৯৫০ সালে খাপড়া ওয়ার্ডের গুলিতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এদিকে এখানে পুলিশ মরিয়া হয়ে মুগুর দিয়ে পিটিয়ে কৃষক নেতা বিষ্ণু বৈরাগীকে হত্যা করে। তখন এক বিষ্ণু বৈরাগীর স্থলে জন্ম নেন শত বিষ্ণু বৈরাগী। আন্দোলন তখন শতগুণ তীব্রতর হয়ে উঠে। সে সময় সাহসের কৃষক নেতা আফছার মোড়লেরও মৃত্যু ঘটে। কর্তৃপক্ষ তখন বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় কয়েদীদের জোর করে খাওয়ানোর চেষ্টা করে। জংগী সংগঠন সে চেষ্টাও ব্যর্থ করে দেয়। আর তারপর থেকেই আদম সন্তানদের দিয়ে ঘানি টানা বন্ধ হয়

এবং অপরাপর দাবীগুলিও কর্তৃপক্ষ মানতে বাধ্য হয়।

এদিকে ৩৯৬ নং ধারায় বিষ্ণুদা' ও অপরাপরকে বিচারের জন্য যে দিন প্রথম কোর্টে হাজির করে, সে দিন এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হয়। সেদিন সমুদয় অফিসের সমুদয় কর্মচারী নানান কিংবদন্তির নায়ক—ইংরেজ খেদা আন্দোলনের মহান বিপ্লবী—বিষ্ণুদাকে এক নজর দেখার জন্য খুলনা কোর্টে এসে জমায়েত হয়। সে এক অবিস্মরণীয় দৃশ্য! কোর্টের ছোট্ট প্রকোষ্ঠের চতুর্দিকে হাজার হাজার লোকের উপস্থিতিতে পেছনের অধিকাংশ দর্শকের পক্ষেই তখন বিষ্ণুদাকে এক নজর দেখাও সম্ভব হয়নি। তবে দেখতে ব্যর্থ হয়েও তাদের আত্ম-তৃপ্তি হয়েছিল যে. তাকে দেখার কোন চেষ্টারই কসুর তারা করেনি।

পক্ষান্তরে এহেন বিপ্লবী নেতার পক্ষে উকিল সংগ্রহ করা তখন বিরাট এক সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। কারণ যিনিই তাঁর পক্ষ হয়ে ওকালতি করবেন, তাকেই তদানিন্তন স্বৈরাচারী সরকারের কোপানলে পড়তে হবে। বস্তুতঃ তদানিস্তন ফ্যাসিবাদী সরকার তাঁকে ফাঁসিতে ঝুলাবার জন্যে সব রকম আট-ঘাট বেঁধেই রেখেছিল। এমনি অবস্থায় সম্মুখে এগিয়ে এলেন মহান মানব দরদী, অসম সাহসী রাজনীতিক, এ্যাডভোকেট আব্দুল জব্বার। আর বিচারের শেষ পর্যায়ে এসেছিলেন ব্যারিষ্টার গনি। অবশ্য ব্যারিষ্টার সাহেব নানান চাপের মুখে তখন সেলিম হোটেলে থাকতে বাধ্য হন। উল্লেখ্য যে, সে সময় মাওলানা আহম্মদ আলী সাহেবও ঐ মার্ডার কেসে পড়ে ছিলেন। আর জনাব এ, কে, ফজলুল হক একক ভাবে তার কেস পরিচালনা করে তাকে ছাড়ায়ে নেন।

এদিকে সরকারের নেক নজরে পড়ে ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির আশায় জননেতাকে সুকৌশলে ধরে বিচারের কাঠ গড়ায় দাঁড় করায়েই দালালটি দেখল যে, জনতার কাছে তার আর পরিত্রাণ নেই।

তাই সে তখন খুলনা শহরে এসে হাদিস পার্কের পশ্চিম পার্শ্বের চালনা হাউজের নিচের তলায় বৎসরাধিক কাল আত্ম গোপন করে থাকে। সরকার তথায় তার প্রহারার জন্য পর্য্যাপ্ত সশস্ত্র প্রহরীও প্রদান করে। তাতেও আশ্বস্ত হতে না পেরে জনতার ভয়ে দিনের বেলাও সে ঐ দালানের সবক'টা জানালা বন্ধ করে নিজেকে নিজে বন্ধী করে রেখে গীতিকারের গীতের যথার্থতারই প্রমান করে ঃ

বিচারপতি, তোমার বিচার করবে যারা,
আজ জেগেছে, এই জনতা, এই জনতা।
তোমার গুলির, তোমার ফাঁসির,
তোমার কারাগারের পেষণ শুধবে তারা,
ও জেনো তা' এই জনতা, এই জনতা।
তোমার সভার আমীর যারা,
ফাঁসীর কাষ্ঠে ঝুলবে তারা,
তোমার রাজা, মহারাজা,
করজোড়ে মাগবে বিচার,
ঠিক জেন তা এই জনতা।

★ ★ ★

নিঃস্ব যারা সর্বহারা তোমার বিচারে—
সে নীপিড়িত জনগণের পায়ের ধারে,
ক্ষমা তোমার চাইতে হবে,
নামিয়ে মাথা হে বিধাতা,
রক্ত দিয়ে শুধতে হবে
নামিয়ে মাথা হে বিধাতা,
ঠিক যেন তা এই জনতা।

বস্তুতঃ জনতার বিচারে প্রকৃত অপরাধীদেরকে দালালটির ন্যায়ই আত্মদগ্ধ হতে হয়। কিন্তু মুর্খরা সে অবস্থার পূর্বমূহুর্ত পর্যন্ত সে শিক্ষা নেয় না।

যাক সে সব কথা। খুলনার অতিরিক্ত জেলা জজ বাবু অনুকুল লাহিড়ীর কোর্টে দীর্ঘ প্রায় এক বছর ধরে সেই মার্ডার কেস চলে। উক্ত কোর্টের নয়জন জুরীর মধ্যে চারজনই ছিলেন বিভিন্ন ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট। আবার মৃত জামাল ফকিরও যেহেতু একজন প্রেসিডেন্ট ছিলেন, সেহেতু উক্ত প্রেসিডেন্ট জুরারদের পক্ষে নিরপেক্ষ রায় দেয়া সম্ভব নাও হতে পারে—এ যুক্তিতে বিবাদিপক্ষ আদালতে আপত্তি তোলেন। আর সে আপত্তির পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তীতে যে জুরারদের মনোনয়ন দেয়া হয় তাদের মধ্যে আট জনই ছিলেন স্কুল শিক্ষক, আর অপর জন ছিলেন কলেজ শিক্ষক। সে জুরারদের সর্ব সম্মত রায়ে অভিযুক্তরা খালাশ পান। এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, উক্ত মার্ডার কেসে একজন মাত্র প্রত্যক্ষদর্শীকে পুলিশ আদালতে হাজির করতে পেরেছিল—তিনি হলেন জনাব সমস্তি শেখ। গ্রেফতারের পর শত নির্যাতন করেও পুলিশ তাঁর কাছ থেকে একটি কথাও বের করতে পারেনি। শত নির্যাতনের মুখেও বাপের বেটা—সমস্তি শেখের ছিল একই কথা—"আমি কিচছু জানিনা"। তিনি তখন মুখে একবার হত্যাকারীর নাম উল্লেখ করলে সে নির্যাতন থেকে অনায়াসেই পরিত্রাণ পেতেন বটে, তবে তার সাথে সাথে হত্যাকারী-দের ফাঁসি ছিল অবধারিত—যে ফাঁসের জন্য সরকার আট—ঘাটের কোন ক্রুটিই রাখেনি। নিজে নির্মম নির্যাতন সহ্য করে এ ভাবে নেতাদেরকে ফাঁসির রজ্জু থেকে ছিনিয়ে এনেছেন, পাক-ভারত-বাংলাদেশ-এর ইতিহাসে এমন উজ্জল নিদর্শন আর ক'টি আছে ?

স্মর্তব্য যে, সে সময় জেলে থাকা কালে বেশ কিছু হিন্দু কমরেড্ (বস্তুতঃ কমরেড হিন্দু বা মুসলিম হয় না, সহজবোধ্য পাঠার্থেই ইহা ব্যবহার করা হলো) পশ্চিম বাংলায় গিয়ে রাজনীতি করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন—তদানীন্তন সরকারও তাই চেয়েছিল। কিন্তু বিষ্ণুদা' ছিলেন তার ঘোর বিরোধী। শত বাঁধা-বিপত্তির মাঝেও তিনি

নিজ কর্মক্ষেত্র ছেড়ে অন্য কোথাও যাননি। তাঁর কথা ছিল—"মাটি কামড়ে পড়ে থাক, কমরেড। সব বাঁধাই একদিন কেটে যাবে।" জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এদেশের মাটি কামড়ে পড়ে থেকে তার কথা ও কাজের সংগতির প্রমানই রেখেগেছেন। ঈষৎ অপ্রাসংগীক হলেও বলাটা বোধ হয় সম্পূর্ণ অপ্রাসংগীক হবে না যে, এতদাঞ্চলের অপর এক জন কমরেড্ সহপার্টি কর্মীদের তৎকালীন ভারত হিজরত রোধ শুধু প্রাণান্ত প্রচেষ্টাই নেননি, বহু নিপীড়ন আর উৎপীড়ন সহ্য করেও অদ্যাবধি এদেশের মাটি কামড়ে পড়ে থেকে শ্মশানে যাবার প্রতীক্ষায় আছেন—তিনি হলেন স্থানীয় অপর মহান কমরেড, বাবু রতন সেন।

বস্তুতঃ মার্কসিষ্টদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো-"দেশপ্রেম" (প্যাট্রিয়টিজম্)। যিনি দেশ ত্যাগ করতে পারেন তার মধ্যে মার্কসিজমের আর কিইবা অবশিষ্ট রইলো? অবশ্য ১৯৪৮ সালের বাম বিচ্যুতির পর অসহনীয় নির্যাতনের মুখে যাদেরকে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছে তাদের কথা স্বতন্ত্র।

যাক, জামাল ফকির মার্ডার কেসে উপরোক্ত সর্ব সম্মত রায়ে আসামীরা খালাস পেলেও জেল থেকে মুক্তি পাননি। অতঃপর কেস রেফার করা হয় ঢাকা হাইকোর্টে। হাইকোর্ট তা' পুনর্বিচারের জন্য খুলনা পাঠায়। কেস ফেরৎ পাঠাবার সাথে সাথে হিন্দু জজের স্থলে একজন মুসলিম জজকেও ঢাকা থেকে পাঠান হয়। এবার নয় জন জুরার-এর মধ্যে ছয়জন আসামীদের নির্দোশ বলে মত দেন। অগত্যা তখন মহামান্য জজ আসামীদের খালাস দেন। কিন্তু সে রায়ে অপরাপর সকলে খালাস পেলেও বিষ্ণুদাকে খালাস-দেয়া হয়নি। তাকে তখন আর্মস্ (রিভলবার) কেসের ১৯ নং ধারায় বিচার করা হয়। বিষ্ণুদাকে যে মীরজাফর রিভলবার সমেত পুলিশের কাছে ধরিয়ে দেয় তাকে পুর্ব ঘোষণা অনুসারে সরকার তখন

এক হাজার টাকা এবং একটি রিভালবার দিয়ে পুরস্কৃত করে। শুনা-যায় মেদ বহুল জমিদারও নাকি পারিতোষিক হিসাবে তাকে পর্যাপ্ত পরিমাণ জমি দিয়েছেন!

স্মরণ করান যেতে পারে যে, যে রিভালবার সমেত বিষ্ণুদা' মৌখালী নদীতে পড়ে গিয়েছিলেন, এবার সে রিভলবার রাখার অপ-রাধে তাঁর বিচার হয়। দীর্ঘদিন সে আর্মস কেস চলার পর ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর মাসে তাকে দেড় বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়। সে কারাদণ্ড ভোগের পরও স্বৈরাচারী সরকার তাকে মুক্তি দেয়নি। মুক্তি লগ্নে জেল গেট থেকে নিরাপত্তা আইনে তাকে পুণরায় আটক করা হয়। বস্তুতঃ সে নিরাপত্তা আইনটিও ছিল বড় মজাদার। আটক পরওয়ানায় লেখা থাকতো, "গভর্ণর ইজ সেটিস্‌ফাইড্‌ ছাট্‌ ইউ হাব ইনডালজড্‌ ইন সাব্‌ভারসিভ্‌ এ্যাকটিভিটি এ্যাণ্ড এ্যান্টি ষ্টেট একটি-ভিটিজ।" সে আইনে সুনির্দ্দিষ্ট কোন কর্মধারার উল্লেখ বা সে কর্ম আদৌ তিনি করেছেন কিনা তা প্রমাণেরও কোন প্রয়োজন হতো না। গভর্ণর 'সেটিস্‌ফাইড্‌' হলেই হলো। আবার অধিকাংশ স্থলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তির প্রকৃত কর্মকাণ্ড গভর্ণর ব্যক্তিগত ভাবে না জানলেও তার অধীনস্থ ছোট্ট কোন কর্মচারীটিও যদি ঐ আইনের ১৭ (ক) ধারা প্রয়োগ করে বিনা বিচারে তাকে আটক রাখতে চাইতেন, তবে তার জন্য চিরস্থায়ী ব্যবস্থা ছিল এ আইন। ঐ আইনে অভিযোগ-কারীকে যেমনি অভিযোগ প্রমানের প্রয়োজন হত না, তেমনি অভি-যুক্তকেও অভিযোগ খণ্ডনের কোন সুযোগ দেয়া হতো না। বলিহারি সে আইন! কর্তাব্যক্তি যেহেতু একেই আইন বলেছেন, সেহেতু এটাই আইন হলো।

বস্তুত: একেই বলে ভাগ্যের নির্মম পরিহাস! যে মহান ব্যক্তি বিদেশী ইংরেজদের তাড়াতে গিয়ে ইংরেজদের কারাগারে পুনঃ পুনঃ কারাভোগ

করেছেন, সে ইংরেজ বিতাড়িত হওয়ার পর এদেশীয় প্রভুরাও তাকে করলেন কারাবন্দী। ডুমুরিয়ার কৃতিত্বপূর্ণ কর্মধারা তথা দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য যে দেশপ্রেমিকের কর্মছিল অকৃত্রিম-অবিনশ্বর; ইংরেজ বিতাড়িত হবার পর কৃতজ্ঞ জনসাধারণ যেখানে দেবে বরমাল্য, ইংরেজ-দের বরপুত্র অকৃতজ্ঞ পাক সরকার সেখানে তাঁকেই দিল পুনঃ পুনঃ কারাদণ্ড—কোন সভ্য জগতে যা অকল্পনীয়।

তৎকালীন জন নিরাপত্তা আইনে বিষ্ণুদার নিগ্রহের কথা বন্ধ রেখে পরবর্তী বক্তব্য পরিবেশন-এর সুবিধার্থে এখানে তৎকালীন রাজনৈতিক পরিবেশ ও পরিস্থিতির কিছুটা বর্ণনা দেয়া প্রয়োজন।

ষাট ও সত্তর দশকের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট।

১৯৪৬ সালে খাস জমির ধান কৃষকদের খামারে তোলা নিয়ে জীয়লতলায় পুলিশের গুলিবর্ষণ, পরবর্তীতে পুলিশ কর্তৃক অভয়চরণ জোয়ারদারের বাড়ীর ধান লুঠ এবং তার পরবর্তীতে জামাল ফকিরের ঘর জ্বালানী কেস ইত্যাদি মিলে পুলিশী নির্যাতন এবং কৃষক কর্মী-দের ধরপাকড় নিয়ে ডুমুরিয়ায় বেশ একটা উত্তপ্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়। সেই পরিবেশেই ১৯৪৭ সালে লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন ভারতে এসে বৃটিশ সরকারের নির্ধারিত সময় (১৯৪৮ সালের মার্চ)-এর বহু পূর্বেই অর্থাৎ ১৪ই আগষ্ট ভারতকে দু'ভাগ করে ইংরেজেরই সৃষ্ট কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের কাছে হিন্দুস্তান ও পাকিস্তান নামে দু'টি রাষ্ট্রের শাসন

ভার দিয়ে নিজেদের পুঁজি, ব্যবসা বাণিজ্য ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধাদি সুনিশ্চিত করে যায়। "ভারতের বৃটিশ রাজত্বের শেষ অধ্যায়" — শীর্ষক গ্রন্থে মিঃ লিওনির্দ মোজলে এক জায়গায় স্বীকার করেছেন যে, মিঃ মাউন্ট ব্যাটন ঐরূপ তড়িঘড়ি ক্ষমতা হস্তান্তর না করলে বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ায় ইংরেজদেরকেই হটতে হতো। কিন্তু বাস্তবতঃ দেখা যায় যে, যারা ঐ বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া ঘটাবার দাবীদার সে কমিউনিষ্ট-পার্টি ঐ বিপ্লবের ধারে কাছেও না গিয়ে গডডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। ঐ পার্টির নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধি মিঃ কৃষ্ণবিনোদ রায়, ভবানী সেন প্রমুখ ১৮ই আগষ্ট (ঐ তারিখে খুলনা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়) এতদাঞ্চলের তদানীন্তন গান্ধী পার্কে (হালের হাদিস পার্কে) আজাদী বা তথাকথিত স্বাধীনতার পক্ষে বক্তব্য রেখেছিলেন।

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উপরোক্ত হাত বদলের ফলে ডুমুরিয়ার বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডও উল্লেখ যোগ্য পরিমাণে শিথিল হয়ে পড়ে। তারই সাথে সাথে নব রাষ্ট্র পাকিস্তানের প্রচার মাধ্যমগুলিও প্রচার করতে থাকে যে, কমিউনিষ্ট পার্টির হিন্দু কর্মীগণ মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানকে ধ্বংস করার জন্যই আন্দোলন করছে, যদিও তারাই (তদানীন্তন মুসলিম লীগারগণই) বিদেশী ইংরেজদেরকে হটিয়ে দেশটিকে স্বাধীন করেছেন! ঐ প্রচারনায় আন্দোলনে লিপ্ত সরল প্রাণ মুসলমানদের একাংশ দারুণ সংশয়ে পড়ে যায়। অপর দিকে হিন্দু কম্‌রেড্‌গণও নতুন পরিবেশ পরিস্থিতি ও প্রচারণার মুখে তাৎক্ষণিক তার উপযুক্ত উত্তর দিতে না পারায় আন্দোলন আস্তে আস্তে স্থিমিত হয়ে পড়তে থাকে। সে অবস্থায় ১৯৪৮ সালে জামাল ফকির হত্যা মামলার সুযোগে পাক সরকার প্রথমে পুলিশ, পরে মেলিটারী দিয়ে ডুমুরিয়ার কৃষকদের উপর নির্মম অত্যাচার চালায়। সে অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে যারা পেরেছেন তারা

তখনই দেশ ছেড়ে চলে গেছেন। আর যারা যেতে পারেননি বা যেতে চাননি, তাদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় বেশ কিছু ব্যক্তীকে সরকার ডাকাতি, মার্ডার, রাহাজানি প্রভৃতি ধারায় জেলে আটক করে রাখে। ঐরূপ অবস্থায় ১৯৪৮ সালে মিঃ পি, সি (পুরণ চাঁদ) যোশীর স্থলে মিঃ রনডিভে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির সেক্রেটারী নির্বাচিত হন। নূতন সেক্রেটারী হয়েই মিঃ রনডিভে নুতন থিওরী দিলেন,—"আজাদী লড়কে লেনা হায়, ইয়ে আজাদী (১৯৪৭ সালের) ঝুটা হায়।" উল্লেখ্য যে, তখনও পাকিস্তান ভিত্তিক কমিউনিষ্ট পার্টি গড়ে ওঠেনি। ১৯৪৮ সালে ভারতে অনুষ্ঠিত কমিউনিষ্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের নির্দেশ ও নেতৃত্বেই তখনও এদেশের পার্টি চলতো। ১৯৪৭ সালে দু'টি স্বতন্ত্র ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হওয়া স্বত্বেও অপর একটি রাষ্ট্রের পার্টির নেতৃত্বে ও নির্দেশে এটি চলা ঠিক হয়েছে কিনা আর ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের নাম বিলুপ্তির পরও ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত একটি পার্টি "পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টি" নাম রাখার স্বার্থকতা কি তার উত্তর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গই দেবেন। সে উত্তরের আশায়ই এখানে ঘটনাটি উপস্থাপন করা হলো। তবে আমরা যা জানি তা হলো, পূর্ব পাকিস্তান বলে যেমন কখনও সার্বভৌম রাষ্ট্র ছিল না, তেমনি পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টিও পাকিস্তান ভিত্তিক কোন সংগঠন নয়। অতএব ঐ পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টির মূল শিখণ্ডি যে কোথায় ছিল তাহাও জানা বাঞ্চনীয়। নেতৃত্বে ব্যর্থদের কেউ কেউ দীর্ঘদিন জেদ করে এমন ভুল করতে পারেন—যদি তাদের প্রলেতারীয় শৃংখলা বোধ ও নিজেদের প্রতি সততার ঘাটতি থাকে। যারা বাস্তবতাকে অস্বীকার করেন তারা মার্কসিষ্ট হন কি ভাবে তা বোধগম্যের বাইরে।

আমরা জানি যে, প্রতিটি দেশ ও তার পার্টি তা যত ছোট বা বড়ই হোকনা কেন তা সম্পূর্ণ ভাবে স্বাধীন ও সার্বভৌমত্ব আর প্রতিটি পার্টি তার দেশের অবস্থান ও অবস্থিতি অনুযায়ী মার্কসবাদের চিরন্তন সত্যের আলোকে বিপ্লবী নীতি নির্ধারণ করবে। অবস্থা ও অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে পার্টি তার রণ-কৌশল পরিবর্তন বা পরি-

বর্ধন করতে পারে, কিন্তু মূল নীতি থাকবে সদা অটুট। অবশ্য। পার্টি তার নীতি নির্ধারণীর বিবরণে বন্ধু প্রতিম পার্টির কাছে প্রেরণ করে যেমন মতামত চাইতে পারে, তেমনি বন্ধুপ্রতিম পার্টিও বন্ধুর মতই তার মতামত দিতে বা সমালোচনা করতে পারে। কিন্তু একটি সার্বভৌম দেশের পার্টিনীতি অপরদেশে যেমন নির্ধারন করে দিতে পারে না, তেমনি একটি দেশের পার্টিও অপর দেশের পার্টির উপর নেতৃত্ব বা কর্তৃত্ব করতে পারে না। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, এখানে তার বিপরীত অবস্থাই ঘটেছে এবং ঘটছে।

একটি পার্টির উচিৎ তার নিজের দেশের বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে তার নিজের অভিজ্ঞতাকে সৃষ্টিশীল ভাবে বিকশিত করা। কেবল এ ভাবেই তার পক্ষে বিপ্লবকে বিজয়ের পথে পরিচালিত করা এবং সর্বহারা বিশ্ববিপ্লবের আদর্শকে সাহায্যে করা সম্ভব। আর উপরোক্ত বিপ্লবে বিজয় সম্পর্কে কমরেড মাও সেতুঙ তাঁর জাপানী শ্রমিক বন্ধুদের যে বাণী প্রেরণ করেছেন প্রসংগতঃ তা প্রনিধান যোগ্য : "জাপানী বিপ্লব নিঃসন্দেহে জয়যুক্ত হবে, যদি মার্কসবাদ-লেনিনবাদদের সার্বজনীন সত্যকে প্রকৃতই জাপানী বিপ্লবের বাস্তব অনুশীলনের সাথে যুক্ত করা হয়।" (অনুবাদ সম্পাদনায় নুরুলহুদা মির্জা : প্যারী কমিউন)

যাক মিঃ রনডিভের থিওরী কার্যকরী করার জন্য ১৯৪৯ সালে পশ্চিম বংগের মুসলিম কমরেড মনসুর হাবিব, ব্যারিষ্টার লতিফ প্রমুখকে পূর্ব পাকিস্তানে, আর উত্তর প্রদেশের ব্যারিষ্টার সাজ্জাদ জাহিরকে পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টির সম্পাদক করে পশ্চিম পাকিস্তানে প্রেরণ করা হয়। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, সে সময় যশোরের ডাঃ মারুফ হোসেন ও ডাঃ সাইফ-উদ-দাহার কার্যব্যপদেশে এখানে এসে থেকে যান। ব্যারিষ্টার লতিফ খুলনা এসে 'অশোক' নামে ডাঃ অতুলেন্দ্র নাথ দাসের বাসায় ওঠেন। বেশ কিছুদিন তিনি ডি, আইন বিদের চোখে ধুলো দিয়ে ডাক্তার বাবুর বাসায় থাকার পর কিভাবে ধরা পড়েন এবং সে ধরা পড়ার পরও ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে গিয়ে

কিভাবে আত্ম পরিচয় গোপন রেখেছিলেন, তার বিস্তারিত বিবরণ জনৈক লেখক তার—"খুলনা শহরের ইতিকথা" শীর্ষক গ্রন্থে লিখেছেন। এখানে নূতন করে যা বলা প্রয়োজন তা হলো, সে সময় যে সব পার্টি-কর্মী জেলে ছিলেন তাদের প্রতি ভারতীয় পার্টি সেক্রেটারীর নির্দেশ ছিল যে, তারা যেন জেলে এমন সব দাবী নিয়ে আন্দোলন করেন যা সরকার পুরণ করতে না পারে। আর সে আন্দোলনের ফলে যদি গুলি হয় তবে জনতা তখন সংঘবদ্ধ হবে এবং ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের বাস্তিল দুর্গের ন্যায় জেল ভেংগে তাদের ছিনিয়ে আনবে।

উপরোক্ত নির্দেশ অনুসারে ঢাকা, রাজশাহী প্রভৃতি জেলে কয়েদীরা "রেশন চার্জ তের আনার স্থলে এক লাফে সাড়ে তিন টাকা বরাদ্দ করা, আর তার সাথে সাথে বর্দ্ধিত হারে মাছ-মাংস প্রদান, রুটির সাথে মাখন এবং চা ও তার সাথে চামচ সরবরাহ সহ মোট ২১ দফা দাবী নিয়ে আন্দোলন করে।" আর তারই পরিণতিতে ২৭শে এপ্রিল ১৯৫০ সালে রাজশাহী জেলের খাপড়া ওয়ার্ডে গুলি চলে। তাতে আনোয়ার ও অপরাপর কতিপয় বিপ্লবী বীর প্রাণ হারান। সে বেপরোয়া গুলিতে হাবিব মুনসুর উরুতে গুরুতর ভাবে আহত হন। কিন্তু উপরোক্ত থিওরী অনুসারে ঐ গুলির পর বাহিরের জনতা কতটুকু সংঘবদ্ধ হয়েছিল বা তারা বন্ধীদের ছিনিয়ে আনতে কতটা এগিয়ে গিয়েছিল তা পাঠক মাত্রই অবহিত আছেন। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, একটি বিদেশী নেতার থিওরীতে এখানকার নেতারা সে আত্মাহুতি দিলেন!

যাক সে সব কথাও। যে নিরাপত্তা আইনে বিষ্ণুদা' জেল খাটছিলেন সে নিরাপত্তা আইনের অসারতা ও তার প্রয়োগ বিধির কিছু বিবরণ ইতিপূর্বেই দেয়া হয়েছে। এবার তার অবশিষ্টাংশ এবং ডুমুরিয়া আন্দোলনের সংশ্লিষ্ট অপরাপর প্রাসংগিক বিষয়ে ফিরে যাওয়া যাক। স্মরণ করান যেতে পারে যে, ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে যুক্ত ফ্রন্ট ক্ষমতায় যায়। সে নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট যে ২১ দফা পালনের

ওয়াদা দিয়েছিল তার ১৪ নং দফায় ছিল :

"জন নিরাপত্তা আইন ও অর্ডিনেন্স" প্রভৃতি কালা কানুন বাতিল ও রহিত করতঃ বিনে বিচারে আটক সমস্ত বন্ধীকে মুক্তি দিতে হবে ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রকাশ্য আদালতে বিচারের ব্যবস্থা করা হবে। এবং সংবাদপত্র ও সভা সমিতি করা অবাধ ও নিরংকুশ করা হবে।"

উপরোক্ত পরিস্কার ওয়াদা দিয়ে ক্ষমতায় গিয়েও যুক্তফ্রন্ট নেতারা বিষ্ণুদা' ও ইংরেজ খেদা আন্দোলনের প্রথম কাতারের অপরাপর সৈনিকদের মুক্তি দেননি। উক্ত ফ্রন্টে সংশ্লিষ্ট কেউ হয়তোবা আজ সাফাই গাইতে পারেন, —"যুক্তফ্রণ্ট কতদিনই বা ক্ষমতায় ছিল? তাদের ক্ষমতারোহণের কিছুদিন পরেইতো ৩০শে মে তদানীন্তন কেন্দ্রীয় সরকার ৯২ (ক) ধারা প্রয়োগ করে গভর্ণরের শাসন জারী করে।" সে সাফাইয়ের জবাব হলো যে, সে সর্বনাশা নিরাপত্তা আইন তুলে নিতে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মুক্তি দিতে সে কয়দিনওতো লাগার কথা নয়? ওয়াদার প্রতি বিন্দু মাত্র শ্রদ্ধাবোধ থাকলে ক্ষমতারোহণের সাথে সাথেইতো কলমের এক খোচায় বিনা বিচারে আটক সমস্ত বন্ধীকে অনায়াসেই মুক্তি দিয়ে দেওয়া যেতো। আজ পরিস্কার হয়ে গেছে যে; যুক্ত ফ্রণ্টওয়ালারা বিনা বিচারে আটক বন্ধীদের মুক্তি না দিয়ে এবং অপরাপর ওয়াদা পূরণ না করে জনগণের সাথে চরম বিশ্বাপঘাতকতাই করেছেন। উল্লেখ্য যে, ভোটের আগে পরে অনুরূপ বিশ্বাসঘাতকতা পরবর্তী সরকারগুলিও করেছেন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, নির্বাচনকালে অপর একদল —"দশ টাকা মণ দরে গম, আর বিশ টাকা মণ দরে চাল খাওয়ার" ওয়াদা দিয়ে ক্ষমতায় গিয়েই দশ টাকা সের দরে চাল খাইয়েছেন। গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী সকল ক্ষমতাশীলদেরই ভোটের পূর্বে অনুরূপ ভাবে জনগণকে ধোকা দেয়ার দেদার

নিদর্শন আছে।

যুক্ত ফ্রন্টের যে ২১ দফার কথা বলা হয়েছে তার ২ নং ধারায় ছিল ঃ

"বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী ও সমস্ত খাজনা আদায়কারী স্বত্ব উচ্ছেদ ও রহিত করে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বিতরণ করা হবে। উচ্চ হারের খাজনা ন্যায় সংগত ভাবে হ্রাস করা হবে।" কিন্তু বাস্তবে দেখা-যাবে, বিনা খেসারতে যেমনি জমিদারী উচ্ছেদ হয়নি, তেমনি উক্ত ওয়াদা মাফিক খাজনাও হ্রাস করা হয়নি।

অনুরূপ ভাবে ৩নং ধারায় ছিল ঃ

"পাট ব্যবসাকে জাতীয়করণ করতঃ পূর্ব বাংলা সরকারের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনে আনয়ন করে পাট চাষীদের পাটের ন্যায্য মূল্য দেবার ব্যবস্থা করা হবে"।

পাট ব্যবসা জাতীয়করণ বা পাটের ন্যায্য মূল্য দেয়ার প্রতিশ্রুতিও যে বাস্তবায়িত হয়নি তাও আজ আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এখানে এসব উদ্ধৃতি দেয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, সে সময় যুক্ত ফ্রন্ট-ওয়ালারা একুশ দফার বেশ ক'টা দফায়ই নিরহ কৃষকদেরকে ওয়াদা দিয়ে ভোট নিয়ে ক্ষমতায় গিয়েই বৃদ্ধাংগুলি দেখিয়েছেন। শুধু কৃষক-দের কথাইবা বলি কেন? শ্রমিকদেরকেও অনুরূপ মিথ্যা ওয়াদা দিয়ে প্রলুব্ধ করে বঞ্চিত করেছেন। যেমন ২১ দফার ৫ নং দফায় ছিলঃ—

"পূর্ব বাংলাকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিল্পায়িত করে ও কৃষিকে আধু-নিক যুগোপযোগী করে শিল্প ও খাদ্যে স্বাবলম্বী করা হবে। এবং আন্তর্জা-তিক শ্রম-সংস্থার মূল নীতি অনুসারে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক, সামাজিক প্রভৃতি সকল প্রকার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা হবে।"

উক্ত একুশ দফা ওয়াদা প্রদানের তিন দশক পর আজ শিল্প শ্রমিকগণই বলতে পারেন যে, তাদের ঐ ওয়াদানুসারে এদেশ শিল্পা-য়িত হয়েছে কিনা বা তারা ওয়াদা মাফিক আথিক ও সামাজিক অধি-

কার পাচ্ছেন কি না?

বলা বাহুল্য যে, পূর্বোল্লেখিত ৯২ (ক) ধারা তুলে নেয়ার পর পর্যায় ক্রমে জনাব আতাউর রহমান খান ও আবু হোসেন সরকার গদ্দীনশীল হয়েছিলেন। প্রশ্ন থেকে যায় যে, উপরোক্ত ওয়াদার প্রতি তাদেরও সামান্যতম শ্রদ্ধাবোধ থাকলে তাদের আমলেই বা তা পূরণ করা হলোনা কেন?

যাক, যা বলছিলাম, যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় গিয়ে জন নিরাপত্তা আইন ও অর্ডিনেন্স তুলে না নেয়ায় বিষ্ণুদা' ঐ আইনে পঞ্চান্ন সালের সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত কারাগারে থাকতে বাধ্য হন। অতঃপর আবু হোসেন সরকার অমলে গণ আন্দোলনের মুখেই অক্টোবর মাসে বিষ্ণুদাকে রাজশাহী জেল থেকে মুক্তি দেয়া হয়।

মুক্তি পেয়েই বিষ্ণুদা' যান শোভনা হালদার বাড়ী। দীর্ঘ কারাভোগের পর বিষ্ণুদা' সেখানে গেলে সমস্তি শেখ তাঁকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলেন, আর অপরাপর জনতা তাদের প্রিয় বিষ্ণুদাকে পেয়ে মহা উল্লসিত হয়ে ওঠে। ডুমুরিয়া বাজারে প্রায় অর্ধ লক্ষাধিক লোকের সমাবেশে বিষ্ণুদাকে দেয়া হয় এক ঐতিহাসিক গণ-সম্বর্ধনা। সে সম্বর্ধনার উত্তরে বিষ্ণুদা' বললেন—"ভাইসব, আমাদেরকে লড়াই করেই বাঁচতে হবে। আন্দোলন করেই কৃষকদের দাবী আদায় করতে হবে। ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে সরকারের দ্বারে দ্বারে ধরণা দিলে কানা কড়িও মিলবে না। এ সরকার বড়ই নির্মম, ইত্যাদি, ইত্যাদি।"

বিষ্ণুদা' আপাততঃ মুক্তি পেলেও ঐ সর্বনাশা কালা কানুন বলবত থাকায় এক মাস পরেই অর্থাৎ নভেম্বর মাসে তদানীন্তন সরকার আটক আইনে তার বিরুদ্ধে পুনরায় হুলিয়া জারী করে। সে সময় দেশে চলছিল এক দুর্বার গণ আন্দোলন। হাজারো সভায় লক্ষ কণ্ঠে

অসংখ্য শোভা যাত্রায় ধ্বনিত হতে থাকে—"রাজবন্দীদের মুক্তি চাই—বিষ্ণুদার হুলিয়া নিতে হবে তুলিয়া।" আর সে কারণেই ১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তদানীন্তন সরকার সে হুলিয়া তুলে নিতে বাধ্য হয়। আবার ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের সামরিক শাসন জারীর সাথে সাথে অর্থাৎ অক্টোবর মাসে তাঁকে পুনরায় গ্রেফতার করা হয়। সেবার প্রায় দু'বছর জেলে রাখার পর শারীরিক অসুস্থতার দরুন ১৯৬০ সালের জুলাই মাসে তাকে মুক্তি দেয়া হয়। এভাবে পুনঃ পুনঃ জেল খেটে তিনি একদিকে হয়ে পড়েন শারীরিক ভাবে অসুস্থ ও নানান দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত। অপর দিকে সে সর্বনাশা জন নিরাপত্তা আইন ও ডিফেন্স রুল বলবত থাকায় তাকে পুনঃ পুনঃ গ্রেফতার করায় তার পক্ষে তখন আন্দোলন করা দূরে থাক, উন্মুক্ত আলো বাতাসে ঘুরে বেড়ানোর অবকাশও ছিল না।

এদিকে আবার ১৯৬৪ সালের অক্টোবরে আপত্তিকর বক্তৃতা দেওয়ার অভিযোগে সিকিউরিটি এ্যাক্ট-এর ৭(৩) ধারায় বিষ্ণুদাকে পুনরায় গ্রেফতার করে ১৯৬৫ সালের জুন মাসে জামিনে মুক্তি দেয়া হয়।

ঐ বছরই সেপ্টেম্বর মাসে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় ডিফেন্স অব পাকিস্তান রুল-এ আবার তাকে আটক করা হয় এবং ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি মুক্তি পান। এভাবে পুনঃ পুনঃ কারা বরণ করে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে বার্ধক্যে মুক্তি পেলে তাঁর আর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে শরীক হওয়া বা নেতৃত্ব দেয়ার ক্ষমতা ছিলনা। তদানীন্তন স্বৈরাচারী সরকারও সেটা বিলক্ষণ জেনেশুনেই তাঁকে তখন মুক্তি দেয়।

উল্লেখ্য যে, বিষ্ণুদা' ৪০ বছরের রাজনৈতিক জীবনে ইংরেজ খেদা আন্দোলনে দু'বার, আর সেই ইংরেজ খেদানোর পর পাক আমলে সাত বার মিলিয়ে মোট চব্বিশ বছর কারা বরণ করেছেন। আর সে চব্বিশ বছর কারা বাসের মধ্যে চৌদ্দ বছরই কেটেছে তদানীন্তন স্বাধীন

পাক সরকারের কারাগারে।

ধিক ! শত ধিক !!

বিষ্ণুদা' যদি রাশিয়া বা ভিয়েৎনামে জন্ম নিতেন তবে তিনি হয়তো বা লেনিন—ষ্ট্যালিন বা হোচিমীন হোতেন না। এমন কি ট্রটস্কি বা জোয়ান খুইও হয়তো হতেন না। তবে তার কৃতকর্মের যে যথার্থ স্বীকৃতি মিলত তা নিশ্চিত। তিনি জন্ম নিয়েছেন আমাদের এ অভাগা মীরজাফর—ফজু মল্লিকের দেশে। আমরা হলাম হুজুগে বাংগালী। এ জাতীর জাতীয় চেতনা সম্পর্কে ডবলিউ ডবলিউ হান্টারের মন্তব্য বেশ প্রনিধান যোগ্য :

"এতো পরিশ্রমী, এতো ধৈর্য্যশীল এবং এমন চতুর-জবাব হওয়া সত্ত্বেও বাংগালীরা কেন যে কখনো জাতি হিসাবে পরিগনিত হয়নি সঠিক তার কারণ উপলব্ধি করার প্রয়োজন আছে।"

বাঙ্গালীদের দুঃখ দুর্দশার একটি গুঢ়তম কারণ আছে। তাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদ—এর একটি দৃঢ় মনোভাব থাকলে কখনই তাদের উপর এমন একটানা অত্যাচার হতে পারতো না। ★

"কতকগুলি মৌলিক ও কাঠামোগত ত্রুটি বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ দো-আঁশলা (আর্য, অনার্য, মোংগলীয়, সেমীয়, নিগ্রো প্রভৃতির সংমিশ্রণ—মুহম্মদ এনামুল হক : "বাংলাদেশ ও মুসলমান" শীর্ষক নিবন্ধ) এদেশের মানুষকে একটি জাতি হওয়ার পথে বাঁধা সৃষ্টি করেছে।

"ইংরেজ পূর্ব আমলে আফগান, তাতার ও মোগলগণও ভারতে এসে দেখতে পেয়েছেন যে এখানকার আর্যরা দীর্ঘ অলসতার ফলে শক্তি-হীন হয়ে পড়েছে এবং নিজেদের মধ্যে শতধা বিভক্ত হয়ে জাতীয়তা-বাদের সকল মনোভাব হারিয়ে ফেলেছে।" ★ ★ এ জাতীয় চেতনা-

---

—★★ ডব লিউ ডবলিউ হান্টার : এনালস অব রুরাল বেংগল।

হীনতার সুযোগই তাদের পক্ষে শত শত বছর এদেশ শাসন ও শোষণ করা সম্ভব হয়েছে। মার্কসের ভাষায়.—"যে দেশের লোক গরু ও বানরকে দেবতা বলে জানে সে দেশ পরাধীন হতে বাধ্য।"

"কথিত আছে যে, নবাব সিরাজ উদ্দৌলার সেনাবাহিনীর সাথে রবার্ট ক্লাইভের সেনা বাহিনীর যুদ্ধের সময় স্রেফ তামাসা দেখার জন্য পলাশীর আম্রকানন ঘিরে যে বিপুল সংখ্যক বংগ সন্তানের সমাবেশ ঘটেছিল তারা সবাই একটি করে ঢিল ছুঁড়লেও ক্লাইভের সেনাবাহিনী রণভংগ দিতে বাধ্য হতো।" ★ অনুরূপ মজা দেখার পরিনতি বা ভাবাবেগের ফল অনুরূপ ভয়াবহই হয়ে থাকে।

বলা বাহুল্য যে, জাতীয়তাবাদের ঐ প্রগতিশীল ভূমিকাও আজ আর নেই। বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদীদের লগ্নী পুঁজি গ্রহণ করে জাতীয় বুর্জুয়ারা আজ সাম্রাজ্যবাদের দালাল হয়ে জাতীয় বেইমানে পরিনত হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের সে শোষণ থেকে আজ জাতি ও দেশকে রক্ষা করতে পারে একমাত্র জাতীয় শ্রমিক শ্রেণী—অপর কেউ নয়।

আপসোস, মহান বিপ্লবী নেতা বিষ্ণুদা' ইংরেজ আমলে ইংরেজ খেদা আন্দোলনে পুনঃ পুনঃ জেল খেটে জেল বিরতির সুযোগে আন্দোলন করেছিলেন। কিন্তু সে ইংরেজ বিতাড়িত হওয়ার পর এদেশের তদানীন্তন অকৃতজ্ঞ সরকার তাঁকে সে বিরতিটুকুও না দিয়ে দীর্ঘ একটানা অন্তরীণ করে রাখে। অতঃপর উনসত্তর সালের ফেব্রুয়ারী মাসে গণ-আন্দোলনের মুখে তাঁকে মুক্তি দেয়া হয়।

ঐ দীর্ঘ কারাবাসে একদিকে তাঁর রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্র ডুমুরিয়ার সংগঠন ভেংগে পড়ে। সঠিক নেতৃত্বের অভাবে কেউ কেউ তখন প্রতিক্রিয়াশীল সুবিধাবাদী দলে ভিড়ে পড়ে, আবার কেউ কেউ নক্সাল আন্দোলনে যোগ দেয়।

☆ অনিল মুখার্জী: "স্বদেশপ্রেম, জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিক" শীর্ষক নিবন্ধ।

অপর দিকে ঐ দীর্ঘ অন্তরীণাবদ্ধের সুযোগে সামন্তসেনায় তাঁর বিষয় আশয় সুবিধাবাদী চক্র স্বাচ্ছন্দে ভোগ দখল করে নেয়। বিষ্ণুদার জ্ঞাতিভাই বলরাম চ্যাটার্জীর জায়গা জমি ইতিপূর্বেই বিষ্ণুদাকে উইল করে দিয়ে যান। সে জায়গা জমিও ঐ স্বার্থান্বেষী মহল ভোগদখল করতে থাকে।

বিষ্ণুদা' যখন মুক্তি পান তখন তিনি শুধু বৃদ্ধই নন, দীর্ঘ কারা ভোগের পর তাঁর তখন হয়েছিল দাঁতের পীড়া ও চোখের যন্ত্রণা। মাঝে মাঝে গলা দিয়ে রক্ত পড়তো—কোন কোন ডাক্তার তার টি, বি হওয়ার কথাও বলেছেন।

সে সময় মুক্তি পেলেও বার্ধক্য ও শারিরীক অসুস্থতার দরুন তখন তাঁর পক্ষে প্রত্যক্ষ রাজনীতি করা বা রাজনীতিতে নেতৃত্ব দেয়া যে সম্ভব ছিলনা। সরকার তা ভালো ভাবে অবহিত হয়েই সে মোক্ষম সময়ে তাঁকে মুক্তি দিয়েছে। আর সে কারণেই তিনি মুক্তি পেয়েই সামন্ত সেনায় তাঁর হারান বিষয় আশয় পুনরুদ্ধারে মনোনিবেশ করেন।

তিনি প্রথমেই মনযোগ দেন বলরাম বাবুর জমি পুনরুদ্ধারের কাজে। সে কাজে তাঁকে সর্বাত্মক সহায়তা করেন বিশিষ্ট এ্যাডভোকেট—প্রাক্তন মন্ত্রী—বিষ্ণুদার বাল্যবন্ধু ও হিতাকাংখী—জনাব দেলদার আহমেদ। দেলদার সাহেবই বিষ্ণুদাকে নিয়ে গিয়ে তৎকালীন এস, পি সাহেবের কাছে পরিচয় করিয়ে দেন এবং এস, পি সাহেবের সহায়তায়ই বিষ্ণুদা' বলরাম বাবুর বিষয়-আশয় পুনরুদ্ধার করেন। তবে সে পুনরুদ্ধারে কায়েমী স্বার্থান্বেষী চক্রের স্বার্থহানী হওয়ায় স্বভাবতই তারা তাঁর প্রতি রুষ্ট হয়ে ওঠে। সে সময় অর্থাৎ ১৯৭১ সালের দুর্যোগময় মুহূর্তে ঐ অঞ্চলে আইন শৃঙ্খলা বলতে কিছুই ছিল না। চুরি-ডাকাতি হরদম চলতে থাকে। কিছু দুর্বৃত্ত একরাতে তাঁর বাড়ীও চড়াউ করে। অসম সাহসী বিষ্ণুদা' সে অবস্থায়ও একাই তাদের প্রতিহত করেন এবং সে অরাজকতার প্রতিকারার্থে তিনি দেলদার সাহেবের সহায়তায় এবং

এস, পি সাহেবের ব্যবস্থাপনায় সামন্তসেনায় একটি পুলিশ ফাঁড়ী বসান। তাতে অরাজগ সৃষ্টিকারী চক্রের স্বার্থহানি হওয়ায় বিষ্ণুদার প্রতি তাদের প্রতিহিংসার উদ্রেক ঘটে।

উপরোক্ত প্রতিকুল অবস্থায়ও বিষ্ণুদা' সাইকেলে চড়ে সামন্তসেনায় স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াতেন। তেমনি অবস্থায়ই ১১ই এপ্রিল (১৯৭১ সালের) দুপুর বেলা সাইকেল নিয়ে নৈহাটি স্কুলের পূর্বপার্শ্বে বুড়ীর বটতলার কাছে দাঁড়ায়ে জুতো সেলাই করাচ্ছিলেন। ঐ অবস্থায় একদল আততায়ী ওৎ পেতে তা অবলোকন করে। বিষ্ণুদা' জুতা সেলাই করে যখন কর্ণপুর ষ্টেশনের পূর্ব দিকের রেল লাইন ধরে ফিরছিলেন তখন সে আততায়ীরা হঠাৎ করে এসে তাঁর বুকে ছুরি বসিয়ে দেয়। নিঃসংগ বিষ্ণুদা' সে অবস্থায়ও একটি লাঠি পাবার আশায় "লাঠি লাঠি" করে চিৎকার করেন। বস্তুতঃ এহিয়া চক্রের তৎকালীন ত্রাস সৃষ্টির দরুন তখন সে অঞ্চলের রাস্তা ঘাট ছিল জন মানবহীন—ফাঁকা। আর তাই তখন তার সাহায্যার্থে কেউ লাঠি নিয়ে আসতে পারেনি। ★ তবুও বলি, এটা যদি প্যালেষ্টাইনীদের ব্যাপার হতো, তবে এতদিনে তার বদলা নেয়া হতো। আর যদি ইহুদীদের ব্যাপার হতো তবে তৎক্ষণাতই এক তুল কামাল কাণ্ড ঘটে যেতো। আমরা হলাম ভাবাবেগে পরিচালিত অদৃষ্টবাদে বিশ্বাসী এক জাত। ছিচল্লিশের ভোটে আমরা যে পাকিস্তানের পক্ষে রায় দিয়েছি, আবার আমরাই সেই পাকিস্তানের কপালে লাথি মেরেছি। আমাদেরই এক শ্রেণী জনাব

☆ বুকে ছুরি বিদ্ধ স্থানে হাত চেপে বিষ্ণুদা' যখন রেল লাইনের পার্শ্বে পড়ে ছিলেন তখন কিছু লোক বিষ্ণুদাকে চিনতে পেরে ধরাধরি করে আকবরাবাদের ইউনিয়ন চেয়ারম্যানের কাছে নিয়ে যায়। সেখানেও তিনি এক ঘণ্টাকাল জীবিত ছিলেন। বিস্ময়ের বিষয় যে, ঐ এক ঘণ্টা জীবিত থাকা অবস্থায় আততায়ীদের নাম প্রকাশের জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি তাদের নাম উল্লেখ করেননি। —লেখক।

শেখ মুজিবর রহমানকে ভাই, বন্ধু, এমনকি জাতির পিতা বলে আখ্যায়িত করেছে। আবার অপর একদল তাঁকে হত্যার তীব্র তাগিদ বোধ করেছে। কিসিঞ্জারের তলাহীন ঝুলির দেশটিকে জিয়াউর রহমান সাহেব যখন একটি মর্যাদাশীল রাষ্ট্রে পরিনত করার এক ধাপ এগিয়ে নিয়েছিলেন, তখনই বিদেশী রাষ্ট্রের ইংগিতে একদল তাকেও হত্যা করে।

তাই বলছিলাম—ভাবাবেগে পরিচালিত জাতির পরিণতি বরাবরই ভয়াবহ হয়ে থাকে। তাই আর ভাবাবেগ নয়। বাস্তব দ্রষ্টা বিষ্ণুদাকে সে ভাবালুতার মামুলী জিন্দাবাদ দিয়েই সমাপ্তি টানবোনা, তাঁর স্মৃতিকে অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত করে আরদ্ধ অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার প্রতিজ্ঞা নিয়েই সমাপ্তি টানছি।

পরিশিষ্ট ঃ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তার অব্যবহিত পরকালীন সময়ে কমিউনিষ্ট পার্টির বিভিন্ন নীতি নির্ধারণী বিচ্যুতিগুলিই এযাবত এ গ্রন্থে দেখান হয়েছে। এবার সে বিষয়ে তৎকালীন কতিপয় পার্টি সদস্যের বক্তব্য ও তার সাথে সাথে আমরাইবা কেন ঐ রূপ একপেশা লিখলাম তার কিছু যুক্তি পাঠকদের বিবেচনার জন্য পরিবেশন করছি।

১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ২১ শে এপ্রিল জার্মান কর্তৃক সমাজতন্ত্রের পীট স্থান রাশিয়া আক্রান্ত হলে এদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি সিদ্ধান্ত নেয়ঃ “এ যুদ্ধ জন যুদ্ধ। ইংরেজদের পক্ষ হয়ে আমাদের যুদ্ধ করা কর্তব্য।” পক্ষান্তরে সে সময় কমিংটাং প্রধান জর্জ ডিমিটভ কমিউনিষ্ট ইন্টারন্যাশনালে বিভিন্ন পার্টি প্রতিনিধির কাছে বলেছেন, “প্রতিটি দেশের

পার্টি যেন তাদের অবস্থা (ষ্ট্যাটিজি) অনুসারে যুদ্ধের ব্যাপারে নিজ নিজ সিদ্ধান্ত নেন। তবে তাদেরকে অবশ্যই ফ্যাসিষ্টদের বিরুদ্ধে থাকতে হবে।" —জর্জ ডিমিটভের সে বক্তব্য সে সময় পার্টি সদস্যের কাছে পৌছেনি। তার প্রথম কারণ তখনকার প্রচার মাধ্যম বর্তমান যুগের টি, ভি; ট্রানজিষ্টারের ন্যায় মুহূর্ত মাত্র সময়ে ঘরে ঘরে পৌছতনা। যান্ত্রিক যান বাহনও তখন এত সুদূর প্রসারী ছিলনা। আর দ্বিতীয় কারণ, আপার ক্যাডার লীডারদের কাছে ডিমিটভের বক্তব্য পৌছলেও তা তারা ইচ্ছাকৃত ভাবেই পার্টির অপরাপর সদস্যের কাছে পৌছে দেননি।

এ প্রসংগে আমাদের বক্তব্য হলো কমিউনিষ্ট পার্টির নীতি অনুসারে ব্যক্তি বিশেষের বক্তব্য প্রাধান্য না পেয়ে অধিকাংশ সদস্যের মত অনুসারেই পার্টির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়—যা পরবর্তীতে স্থান ভেদে উপর থেকে নীচ বা নিচ থেকে উপরের ধাপের সংগঠনগুলিকে অবহিত করতে হয়। মার্কসীয় দর্শনে ইহাকেই গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতা বলা হয়। আলোচ্য সময় এদেশে ঐ গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতা উপেক্ষীত হওয়ায় ব্যক্তি কেন্দ্রীকতা প্রাধান্য পেয়েছিল। এদিকে ঐ যুদ্ধ চলছিল দীর্ঘ পাঁচ বছর (১৯৩৯-৪৪) যাবত। তৎকালীন যোগাযোগ যতই সেকেলে থাকনা কেন, সে দীর্ঘ সময়েও জর্জ ডিমিটভের বক্তব্য পার্টি সদস্যের কাছে পৌছেনি ইহাইবা বিশ্বাস করা যায় কিভাবে?

তাদের মতে তৎকালীন যুদ্ধে-মিত্র পক্ষীয় সাম্রাজ্যবাদী বৃটেনকে পার্টির সমর্থন দেয়ার অপর কারণ ছিল যে, প্রতিপক্ষীয় ফ্যাসিবাদী জার্মান ও জাপান সাম্রাজ্যবাদীদের তখন আবির্ভাব হয়েছিল অধিকতর বর্বরোচিত—সংহারক রূপে। আর তাই তাদের বিশ্বাস ভারতের দোড় গোড়ায় (আসাম-আন্দামান, বার্মা-কোহিমায়) উপস্থিত ঐ ফ্যাসিবাদকে স্বাগতম জানালে পর মুহূর্তেই তারা হয়তোবা নিজেদের প্রকৃত রূপ ধারণ করে এদেশে অশেষ নির্যাতন করতো।

এর উত্তর হলো ; মাও সেতুং-এর পথ ধরে ঐ উভয় সাম্রাজ্য-বাদীদের প্রতিরোধ করে আস্তে আস্তে দেশ মুক্ত করার নীতি গ্রহণ করা হলোনা কেন ? এর উত্তরে তাদের বক্তব্য হলো : প্রথমতঃ মাও সেতুং -এর নেতৃত্বের সঠিকতা তখনও তাদের মনে আস্তা স্থাপন করতে পারেনি। দ্বিতীয়তঃ মাও সেতুং সদৃশ নেতৃত্বও তখন এদেশে ছিলনা। তৃতীয়তঃ চীনের প্রাকৃতিক ও ভৌগলিক অবস্থাও এদেশের মত নয়। চতুর্থতঃ এবং শেষ কথা হলো—চীনের বিরাট সীমান্ত এলাকা জুড়ে আছে রাশিয়া, যার দরুন মুক্তি যোদ্ধারা রাশিয়ার অকুণ্ঠ সাহায্য সমর্থন ও আশ্রয় পেয়েছেন—যা এদেশের বেলায় সম্ভব ছিলনা।

সত্য বটে মাও সেতুং-এর অতুলনীয় প্রতিভা সম্পর্কে তখনও এদেশের অনেকেই অবহিত হয়েছিলেন না। উপরন্তু ভারতবর্ষের অবস্থান ও অবস্থিতিও চীনের অনুরূপ মুক্তি যুদ্ধের সহায়ক ছিলনা। তাই বলে বোম্বের নৌবিদ্রোহে ঐদেশীয় পার্টির সহায়তা না করা এবং তার পরবর্তিতে তেলেংগানার কৃষক বিদ্রোহে উল্লেখ যোগ্য পরিমান গ্রাম দখল করার পরও ঐ বিদ্রোহকে নিন্দা (কনডেমড্) করার মত যুক্তি যুক্ত কোন কারণও থাকতে পারে না।

এবার আন্দোলনের সফলতা ও বিফলতা সম্পর্কে কিছু বলা যাক। তবে আন্দোলন দৃষ্টে সর্বাগ্রেই যা বলা প্রয়োজন তা হলো যে, আন্দোলন দুর্বার রূপ নিলে অনেক অবৈরী সমস্যার সমাধন আপছেই হয়ে যায়। যেমন আলোচ্য সময় (১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে) এতদাঞ্চলে তেভাগা ইস্যুতে উল্লেখ যোগ্য কোন আন্দোলন হয়নি। কিন্তু সংগঠনের জোড়াল ঐক্য দেখে বাহুর গাছার নকুল সরদার (যিনি দু' হাজার বিঘা জমির মালিক), জীয়লতলার অভয় চরণ জোদ্দার (চারশ' বিঘা জমির অধিকারী) ও আর বয়ার সিংয়ের রাম চরণ সরদার (যার দেড় হাজার বিঘা জমি ছিল) স্বেচ্ছায় নিজ নিজ জমির

ধান তেভাগা হিসাবে বণ্টন করে দিয়েছেন।

ঐ আন্দোলনের অপর উল্লেখ যোগ্য সাফল্য এই যে, আন্দোলন যখন দুর্বার রূপ নেয় তখন মহাজন ও মাঝারী ধরণের ভুস্বামীগণ—যারা ক্ষুদ্র কৃষকদের জমি বন্ধক রেখে সুদে টাকা দিয়েছিলেন তাদের অনেকেই তখন বিনা সুদে যে সব বন্ধকী জমি ফেরৎ দিয়েছেন।

তবে অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এ আন্দোলনটা পুরাপুরীই হয়েছে অর্থনৈতিক; যেমন—পয়সার বিনিময়ে টকি বাইসকোপ প্রদর্শন বন্ধ আন্দোলন, হাটতোলা বিরোধী আন্দোলন, খাস জমি দখল আন্দোলন, বাধ-বন্ধি আন্দোলন ইত্যাদি। কেবল জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ আন্দোলনই ছিল রাজনৈতিক। অবশ্য পুর্বোল্লিখিত অর্থনৈতিক আন্দোলনই রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপ নেয়। তবে সে আন্দোলনকে রাজনৈতিক রূপ দেয়ার জন্য জনগনকে যে ভাবে সচেতন করা প্রয়োজন ছিল তা এখানে হয়নি। কেবল একটা আবেগেরই সৃষ্টি করা হয়েছিল—"সমাজতন্ত্র সমাগত প্রায়। আর সে সমাজতন্ত্র এলেই সব সমস্যার সমাধান হবে।" তাই সর্বশেষে একথা অবশ্যই বলতে হয় যে, উক্ত অর্থনৈতিক আন্দোলনকে রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপ দান করা তদানিন্তন কর্তা ব্যক্তিদের অবশ্য কর্তব্য ছিল—যা তারা করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

।। সমাপ্ত ।।